সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.35Thursday 16 October 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৬তম বর্ষ. ৩৫ সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ১৬ অক্টোম্বর ২০২৬ / ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ   দুর্গাপূজা সংখ্যা-২০২৬

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

দুর্গোৎসবে রাজধানীতে দর্শনার্থীদের সাড়া বনানী পূজামন্ডপে,মহাসপ্তমীতে আরতি

দেশ ও প্রবাসে শারদীয় দুর্গোৎসবে মুখরিত

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাঅষ্টমী উপলক্ষে শনিবরি রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশনে মহা আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবো কুমারী পূজা। বেলা ১১টায় শুরু হয়ে দুপুর ১২টায় এ পূজা শেষ হবে। দেবী দর্শন ও আরাধনায় অংশ নিতে সকাল থেকেই ভক্তরা **-বাকী ২৮ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দধারা বহিছে ভূবনে

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

শাহ্ জে. চৌধুরী

জয় হোক শুভশক্তির: শরৎ ও শারদীয়া দুর্গাপূজা

শাহ্ জে. চৌধুরী

শ্রাবণের বিদায়ে ভাদ্র এসে বসে, ভাদ্রের পরেই আশ্বিনের আগমন। এই ভাদ্র-আশ্বিন মিলনেই আসে শরৎকাল একটি ঋতু, যা আগমনের আগে কোনো সতর্কতা জানায় না। হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয় পথ ও ধানক্ষেত, তারপর আসে রোদ তেজস্বী, ঝলমলে দুপুরের রোদের খেলা। সন্ধ্যার আকাশে আবার মেঘের আনাগোনা। নদী তীরের কাশফুল, গাছে শিউলি, বেলি আর জলে শাপলা প্রকৃতির স্বর্ণালী উপহার। পুকুরপাড়ের তালগাছে পাকা তালের মিষ্টি গন্ধ, আর সেই তাল দিয়ে নতুন ধানের চালে পিঠা, পায়েস সবই শরৎকে করে পূর্ণাঙ্গ।

শরৎ শুধু প্রকৃতির খেলা নয়। শরৎ মানেই শারদীয়া পূজায় দেবী দুর্গার আরাধনা। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দশ দিনের পূজা চলে, যাকে বলা হয় দেবীপক্ষ। সূচনার অমাবস্যা হল মহালয়া। কৃত্তিবাসীর রামায়ণে দেখা যায়, শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা রাবণবধের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এই প্রাচীন কাহিনিই আমাদের জানায় শারদীয়া পূজা কেবল উৎসব নয়, শুভশক্তির বিজয় ও অশুভের বিনাশের প্রতীক। .

আমাদের ছেলেবেলায় পূজা মানে আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-মজা, পিঠা-পায়েসের খোঁজ, আর অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়ার চুপিচুপি দুষ্টুমি। ধর্ম যার যার কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম কেউ কৃতজ্ঞ, কেউ উদাসীন, কিন্তু আনন্দে আমরা একত্র। চন্দনের ফোঁটা, আরতি, পায়েসের গন্ধ সব মিলিয়ে এক অনন্য সৌন্দর্য ও মিলনের উৎসব।

দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধ করে অশুভ শক্তির অবসান ঘটান। এই বিশ্বাস আমাদের শেখায়, পৃথিবীতে এখনও মানুষ চায় শুভশক্তির জয় ও অশুভ শক্তির বিনাশ। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণে যেমন আদর্শ মানুষের চিত্র এঁকেছেন স্বামী, স্ত্রী, ভাই, শাসক শারদীয়া পূজাও আমাদের মনে সৎ, সুন্দর ও দায়িত্বশীল থাকার শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়।

এই শরৎকালেও আমাদের প্রার্থনা দেবী দুর্গা আসুন, ভেদ করুন মানুষের ভেতরে লুকানো মহিষাসুরকে।

জয় হোক শুভশক্তির।

সবাইকে শারদীয়া দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা।

রাজেশ্বরী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

স্বদেশী দুর্গা

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

‘আনন্দমঠ’-এ ভবানন্দ অশ্রুসিক্ত নয়নে যে মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি কেবল দেবী নন–তিনি দেশমাতৃকা। জগদ্ধাত্রী রূপে ‘মা যা ছিলেন’, কঙ্কালমালিনী কালিকারূপে ‘মা যা হয়েছেন’ এবং দশভুজা গৌরী-নারায়ণীরূপে ‘মা যা হবেন’–এই ত্রিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর এক মহিমান্বিত প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন। শরতের আগমনি-আবহে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে বসে তাঁর কলমে জন্ম নেয় ‘বন্দে মাতরম’। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তা ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই গানই বাংলার বিপ্লবীদের প্রধান বীজমন্ত্রে পরিণত হয়।

বঙ্কিমের কল্পনার দেশমাতৃকার মধ্যেই বিপ্লবীরা দুর্গার রাজরাজেশ্বরী রূপে স্বাধীন স্বদেশের প্রতিমূর্তি দেখতে চেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই ভাবনাকে বাস্তব কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেন ‘ভবানী মন্দির’-এর মাধ্যমে। শিবাজির আদর্শে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মন্দির-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দেশমাতৃকার সাধনায় নিবেদিত কর্মী গড়ে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। ‘ঘড় ঈড়সঢ়ৎড়সরংব’-এর আদর্শে আত্মনিয়ন্ত্রণ, শরীরচর্চা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সমাজসেবার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জনশিক্ষা, গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের পরিকল্পনাও ছিল।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই উদ্যোগকে বাস্তব রূপ দিতে ‘ভবানী মন্দির’ ও ‘ঘড় ঈড়সঢ়ৎড়সরংব’ গোপনে মুদ্রণ ও প্রচার করেন এবং বিহারের কাইমুর পাহাড়ে আশ্রমস্থল অনুসন্ধান করেন। প্রতিকূল পরিবেশে স্থায়ী মন্দির সম্ভব না হলেও কলকাতার মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি ও নর্মদাতীরের গঞ্জলনাথ আশ্রমে কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। রক্ষণানন্দের পর কেশবানন্দের তত্ত্বাবধানে শ্রীঅরবিন্দ ও দেশপাণ্ডে সেখানে পাঠশালাও গড়ে তোলেন।

শিবাজির ভবানীকে বাংলার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে কখনো ঘরের মেয়ে উমা, কখনো শত্রুবিনাশিনী দুর্গারূপে কল্পনা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় অবনীন্দ্রনাথের ‘বঙ্গমাতা’, ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে ‘ভারতমাতা’ হয়ে ওঠে। তাঁর ‘চক্ষু সংস্কৃতি’র ধারণায় সেই চিত্র দেবী দুর্গার প্রতিচ্ছবি ধারণ করে জাতীয়তাবাদের এক শক্তিশালী দৃশ্যমান প্রতীকে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসনের কঠোর নজরদারির যুগে বাংলার ধর্মীয় উৎসবগুলি কেবল আচার-অনুষ্ঠানের পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের জনসংযোগ, সংগঠন ও দেশাত্মবোধ জাগরণের আড়াল। দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর জনসমাগমকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, গোপন বৈঠক এবং স্বাধীনতার বার্তা প্রচারের সুযোগ পেতেন। দেবীর আরাধনার অন্তরালে গড়ে উঠত আত্মশক্তি, শৃঙ্খলা ও স্বদেশ চেতনার এক নতুন পরিসর।

এই ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের সিমলা ব্যায়াম সমিতি। বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু ১৯২৬ সালের ২ এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শরীরচর্চা, কুস্তি, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ও সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেমের বীজ বপন করা হয়। সেই বছরই শুরু হয় সমিতির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। এখানে দুর্গা কেবল পূজিত দেবী নন–তিনি হয়ে ওঠেন দেশমাতৃকা, শক্তি ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক। মহাষ্টমীর বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠি, ছুরি ও কুস্তির প্রদর্শন তরুণদের শারীরিক সক্ষমতা ও সাহসের প্রকাশ ঘটাত। জাতি, ধর্ম ও আর্থিক অবস্থার বিভাজন অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এই উৎসবকে আরও তাৎপর্যময় করে তোলে।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার বসু, রাজেন দেব, রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মন ও প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। নারী বিপ্লবীদের মধ্যেও উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা সেন, শান্তি দাস, আশালতা দাস ও কল্পনা দত্তের মতো ব্যক্তিত্ব এই বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী পরিসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সমিতির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হয়। ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে বন্ধ হয়ে যায় পুজো ও অন্যান্য কার্যকলাপ। প্রায় দুই বছর পর, ৭ অক্টোবর, ১৯৩৪ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে পুনরায় শুরু হয় দুর্গোৎসব। নেতাজির প্রত্যক্ষ যোগে এই পুজো পরবর্তীকালে ‘স্বদেশী পুজো’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

একই ধারায় কলকাতার খিদিরপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়। মেদিনীপুরের কর্নেলগোলা আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম মিলনক্ষেত্র। পুজোকে কেন্দ্র করে চলত লাঠি, তলোয়ার, কুস্তি ও শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ। মালদহের গঙ্গাবাগের ব্যায়াম সমিতিকে ঘিরে প্রচলিত ব্যতিক্রমী কালীপুজোয় দশমাথা ও দশহাত বিশিষ্ট মহাকালীর প্রতিমা যেন বহুগুণ শক্তি, সাহস ও অদম্য প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

এইভাবে বাংলার বহু পুজোমণ্ডপে ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল স্বদেশচেতনা ও আত্মশক্তির সাধনা। তাই এই উৎসবগুলি নিছক পুজো ছিল না–পরাধীনতার অন্ধকারে এগুলি হয়ে উঠেছিল সংগঠন, প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগানোর পরিসর। আর ১৯২৬ সালের সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গোৎসব আজও সেই ইতিহাসের এক স্মরণীয় ‘বিপ্লবতীর্থ’।ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে মলঙ্গা লেন এক নীরব অথচ দীপ্ত অধ্যায়। শরীরচর্চা ও কুস্তির আখড়ার অন্তরালে এখানে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের গোপন সংগঠন ও আত্মোৎসর্গের সাধনা। সতীশ মুখোপাধ্যায় ও নীলবরন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত আত্মোন্নতি সমিতি পরে বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সক্রিয় বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়। অনুকূল মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিপ্লবীরা এই পরিসরকে জাতীয়তাবাদী চেতনার কেন্দ্র করে তুলেছিলেন।

অরবিন্দের নির্দেশে বিপ্লবীদের আখড়ায় দেবী আরাধনার সূচনা হয়। ১৯৩৪ বঙ্গাব্দে ৩৪ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পুরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দুর্গাপুজো শুরু হয়। অকালবোধনের প্রতিমায় রামচন্দ্রের স্মৃতি জাগিয়ে বিপ্লবীরা ‘বন্দে মাতরম’, ‘গীতা’ ও ‘আনন্দমঠ’ হাতে স্বাধীনতার শপথ নিতেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও এই পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯৩৫ বঙ্গাব্দে ধরপাকড়ে পুজো বন্ধ হলেও ১৯৩৬ সালে প্রমথনাথ দাশ, সুরঞ্জন পাল, পঞ্চানন দাশ প্রমুখের উদ্যোগে তা পুনরুজ্জীবিত হয়। পরে ‘জলকল পুজো’ নামে পরিচিত এই উৎসব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমাভীতির মধ্যেও থামেনি। পুলিশের নজরদারি, খাদ্যসংকট ও বিপদের মধ্যেও স্থানীয় মানুষ, মণিকলাল নাগা এবং সহৃদয় থানার ওসির সহযোগিতায় পুজো টিকে থাকে। দিনে পুলিশের চোখ এড়িয়ে, কখনো রাতের অন্ধকারে বিপ্লবীরা মাতৃমূর্তির সামনে সমবেত হতেন–দেবী তখন তাঁদের কাছে শুধু আরাধ্যা নন, স্বাধীনতার অগ্নিশপথের প্রতীক।

www.jonmobhumi.com

উৎসব একার নয়, সবার

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন বড় লেখকের লেখায় পড়েছি, যার শৈশব নেই তার মতো অভাগা বোধহয় কেউ নেই। আমি অভাগা নই। আমার অসম্ভব সুন্দর একটি শৈশব আছে। সেই শৈশবের উজ্জ্বল স্মৃতি প্রতিনিয়তই আমাকে নাচিয়ে বেড়ায়, সদ্য একাত্তর পার হওয়া বয়সে এসেও। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমার সেই সোনারং উজ্জ্বল শৈশব-স্মৃতির কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমার সকল শৈশব-স্মৃতির দলিল লুট হয়ে গেছে। বাড়ির সকল সহায়-সম্বলের সঙ্গে আমাদের পরিবারের স্মৃতি ধরে রাখা সাদাকালো অসংখ্য ফটোগ্রাফের অ্যালবামগুলোও বেরসিক তস্করের দল লুটে নিয়েছে। সেই সব অ্যালবামের ভাঁজে ভাঁজে কত না ছবি। তিন ভাইবোনের বেড়ে ওঠা, বাবা-মার অতি পবিত্র একজোড়া হাস্যোজ্জ্বল মুখ,আত্মীয় সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমি ইত্যাদি কত না ছবি ছিল অ্যালবামগুলোতে। শত কাঁদলেও আর ফিরে পাওয়া যাবে না আমার শৈশব স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফিক ডকুমেন্টস।

একটা ফটো আছে আমার স্মৃতিতে ভীষণ উজ্জ্বল। গায়ে বোটল গ্রিন রঙের কর্ডের ব্লেজার, গলায় স্কার্ফ, পায়ে কালো নটিবয় শু। ছোট ভাইয়ের গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি পূজা মণ্ডপের সামনে। পেছনে বর্ণিল দুর্গা প্রতিমা। তার মানে দুর্গাপূজার কোনো একদিনের ছবি। হতে পারে সপ্তমী, অষ্টমী কিংবা নবমীর। ৬০-৬৫ বছর আগে তো হাতে হাতে মোবাইল ফোন ছিল না। তবে আমাদের ছোট্ট জেলা শহরে একটা ফটো তোলার দোকান ছিল। নাম ওরিয়েন্ট স্টুডিও। ফটো তুলতেন সুদর্শন যুবক সুব্রত দা। দা কারও উপাধি হয় কিনা জানি না। তবে শহরের একমাত্র ফটোগ্রাফার সুব্রত দা ছিলেন ছোট-বড় সবার কাছে সুব্রত দা। স্টুডিওর তিনিই ফটোগ্রাফার, তিনিই মালিক। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পার হয়ে সুব্রত দা কীভাবে যে সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের ছোট্ট ফরিদপুর শহরে এসে ফটোগ্রাফের স্টুডিও খুললেন তা ভাবনার বিষয় তো বটেই। মহালয়ার ভোর বেলা থেকেই শুরু হতো শীতের পোশাক পরা। সন্ধ্যে বেলা, পাড়াজুড়ে বাড়িতে বাড়িতে উলু আর শঙ্খধ্বনি আর উঠোনের তুলসীতলায় মা পিদিম জ্বেলে বাড়িময় ধুপ-ধুনো দিতেন। মায়ের গলা জড়িয়ে থাকা শাড়ির আঁচলে ঝুলত চাবির গোছা।

ফিরে আসি বোটল গ্রিন কোট আর স্কার্ফের ফটোতে। তখনকার কার্তিক মাসে ফরিদপুরে অতটাই কি শীত পড়ত, দার্জিলিংবাসীর মতো ওই রকমের শীতের পোশাক পরতে হতো। তাও আবার রোদেলা দিবালোকে? এরকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। উত্তর হলো আগের রাতে ধুমজ্বর এসেছিল। সকালে জ্বরটা একটু কমে আসায় অনুমতি মিলেছিল পাড়ার মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শনের এবং সেটা যথাযথ গরম কাপড় গায় জড়িয়ে। জ্বরটা যে আবার ফিরে আসবে না তাই বা কে জানে ! হঠাৎ না বলে জ্বর আসার কারণ তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি। তখনকার দিনে শরৎ আসতে না আসতে আকাশের কালচে রং বদলে স্বচ্ছ নীলচে হতে শুরু করত। সেই সঙ্গে দিনের বেলা রোদের তেজ বাড়লেও ভোর ভোর সময় কাঁথা গায়ে দিতে হতো। সন্ধ্যা বেলাতেও হালকা শীত। সেই সময় স্কুলে শুরু হতো শরৎকালীন লম্বা ছুটি। কোর্ট-কাচারী করা বয়স্করা বলতেন, অটাম ভ্যাকেশন। আমরা বলতাম পূজার ছুটি। পাড়ায় পাড়ায় তখন প্রতিমা গড়ার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তেতে ওঠা রোদের ভেতর এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে ছোটাছুটি। আর মণ্ডপের গণেশ কতখানি আকৃতি পেল, কার সিংহ কতটা বিকৃতভাবে মুখ হা করে মহিষাসুরকে কামড়ে ধরেছে, আর ময়ূরটা পাখা মেলে উড়াল দিল বলে ইত্যাদি দেখতে দেখতে দুপুর পার। বড়দের কেউ এসে যখন টেনেহিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে হাজির করত তখন সারা শরীর ঘর্মাক্ত এবং কাদামাটি মাখা। ওই ঘর্মাক্ত শরীরে নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি হুটোপুটি। কোনোরকমে নাকেমুখে ভাত গুঁজে বড়দের চোখ ফাঁকি দিয়ে আবার রোদের মধ্যে দে দৌড়। দিনের বেলা তেতে ওঠা গরমের পর সন্ধ্যায় শীতের হিম। দিনের পর দিন এভাবে চললে জ্বর না এসে পারে! আমার এই জ্বরের ব্যাপারটি প্রায় প্রতি বছরেই হতো। পূজার সময় অন্তত একটি দিন ঘরে শুয়ে শুয়ে পার করতে হতো আমাকে। ডাকঘরের অমলের মতো জানালায় বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম বাইরে। দেখতাম নতুন জামাকাপড় পরে সমবয়সীরা প্রতিমা দেখতে যাচ্ছে। দুই চোখ বেয়ে জল গড়াত তখন। পূজার একটা দিন হাত ফসকে বেরিয়ে যাবার কষ্ট সহ্য করা খুবই কঠিন ছিল। একবার পুজোয় সপ্তমী-অষ্টমী দু’দিন রবিনসন্স বার্লি, অ্যালকালি মিক্সার আর সাবু মাখা। নবমীর সন্ধ্যায় জ্বরহীন শরীরে নতুন জামা-প্যান্ট জড়িয়ে যখন মামার হাত ধরে পাড়ার মণ্ডপে যাচ্ছিলাম তখন দুর্বলতায় মাথাটা বেশ টলছিল।

এরপর প্রতি বছর অবস্থা এমন হয়েছিল যে দুর্গাপূজার কথা ভাবলেই জ্বর আসার দুশ্চিন্তা আমাকে এমনই পেয়ে বসত যে পাঁচ দিনের আনন্দ উৎসব উপভোগ করার উৎসাহই দমে যেত। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের ভয় কেটে যেতে শুরু করল এবং প্রতি বছরকার জ্বরও যে কোথায় ভাগল! বড় হয়ে ওঠার পর শারদীয় দুর্গোৎসব আমার কাছে হয়ে উঠল বিশাল এক সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ, যার পরতে পরতে, ভাঁজে ভাঁজে বিনোদন আর আনন্দ। দুর্গোৎসবের পাঁচ দিন একটি ছোট্ট জেলা শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দিনরাত আনন্দ আয়োজনে বুঁদ হয়ে উঠতে দেখে বুঝতে শিখেছিলাম, একেই বুঝি বলে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। পাড়ায় পাড়ায় মেলা, মাইকে শারদীয় আয়োজনের নতুন নতুন গান, মণ্ডপে মণ্ডপে আরতি প্রতিযোগিতা, রিকশায় চড়ে রাতভর শহর ঘুরে প্রতিমা দর্শন, বাড়িতে বাড়িতে নাড়ু-খই-মুড়কি-মোয়ার ছড়াছড়ি। বিসর্জনের দিন কুমার নদের দুই পাড়ে রথখোলায় শহরের বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে আসা সারি সারি প্রতিমা, শত শত যুবকের উদ্দাম আরতি নৃত্য, ধূপের মৌ মৌ গন্ধ, ঢাকের সুরেলা বোল। মাঝখানে বয়ে যাওয়া কুমার নদের জলে অসংখ্য নৌকায় অজস্র দর্শনার্থীর ভেসে বেড়ানো আজও ছবির মতো মনে হয়। দুই পাড়ের অপর্যাপ্ত আলোয় শুরু হয় একে একে প্রতিমা বিসর্জন। একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে লেখা শেষ করি। এই যে শহরজুড়ে পাঁচটা দিন সকলে মিলে উৎসবে মেতে অনাবিল আনন্দ উপভোগ, আত্মীয়-অনাত্মীয়ে, বাড়িতে নাড়ু-মোয়া-পায়েস খাওয়া, নদীপাড়ের মেলা থেকে বর্ণিল মাটির পুতুল কেনা, প্রতি সন্ধ্যায় ধাক্কাধাক্কি করে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন এবং বিসর্জনের সন্ধ্যায় অজস্র মানুষের উপস্থিতি এবং আনন্দ উপভোগ তারা সবাই কি শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্ভবত তা নয়। এখানেই বাংলাদেশের মানুষের অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পবিত্র এক অন্তস্রোত সকলের অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে। তা না হলে একাত্তরে আমরা বিজয়ী হতে পারতাম না।

বাঙালি সংস্কৃতিতে উৎসবের নানা মাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

দেবী দুর্গা ও তার বাহন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

দেবী প্রকৃতপক্ষে সব দেবাত্মশক্তির বিগ্রহরূপা। মানুষের মধ্যে দেবাত্মশক্তির জাগরণ ও বিকাশ না হলে মানুষের অন্তরস্থিত কামরূপী, লোভরূপী, ক্রোধরূপী, হিংসারূপী, বিবেকহীনতারূপী পশু ও অসুরের বিনাশ সম্ভব নয়।

পশু ও অসুরের মিলিত রূপ মহিষাসুর তো আমাদেরই মধ্যস্থিত কলঙ্কিত সত্তা। আবার দেবতেজঃ সম্ভবা দুর্গা বা দেবশক্তিও মানুষের অন্তরস্থিত সত্তা। কিন্তু সেই সত্তা থাকে পশু ও অসুর সত্তার দ্বারা আচ্ছন্ন। বিবেকের অঙ্কুশ যখন আমাদের চেতনাকে বিদ্ধ করে তখনই আমাদের প্রথম জাগরণ ঘটে। নিদ্রাভঙ্গের সেই প্রার্থিত প্রহরে আমাদের মধ্যে দেবসত্তার প্রথম উন্মেষ ঘটে। সেই উন্মেষকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করতে হয়।

সেই পথে অগ্রগতির জন্য প্রথমে চাই এই সচেতনতা-আমাদের শক্তি যেন বহুধাবিভক্ত না হয়, আমাদের শক্তিকে 'সংহত' বা 'কেন্দ্রীভূত' করতে হবে। কেন্দ্রীভূত শক্তির অর্থ বা তাৎপর্য 'সম্পদ' আহরণ। এ সম্পদ নিছক ঐহিক সম্পদ নয়, এ সম্পদ বুদ্ধিকে শুভব্রতে স্থির ও সদা জাগ্রত রাখার কৌশল। শুভব্রতে বুদ্ধিকে স্থির ও সদাজাগ্রত রাখলে নিত্য ও অনিত্যের 'জ্ঞান' বিকশিত হয়। কেন্দ্রীভূত শক্তি, বুদ্ধির স্থিরত্ব এবং জ্ঞানের বিকাশকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন 'যোদ্ধৃত্ব' ও 'বীর্য'। এসব যখন পূর্ণ বিকশিত হয়, তখনই আমাদের অন্তরে দেবশক্তি বা দেবীর বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই বিকাশই শিব বা সর্বকল্যাণের নিধান।

দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। ঋগ্বেদে 'মহিষ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত বলশালী' (ঋগ্বেদ, ৮-১২-৮)। মহিষাসুর প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। শক্তির বিরাট জাগরণ হয়েছে তার মধ্যে, কিন্তু সেই শক্তি মদমত্তশক্তি, অসংযত বিপুল শক্তি। মহিষাসুর যেন গণশক্তি বা শূদ্রশক্তির প্রতীক। পৃথিবীব্যাপী শূদ্রশক্তির প্রব-লতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই শক্তি যদি কল্যাণবুদ্ধি ও বিবেক ঋদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত ও পরিচালিত না হয়, তাহলে সেই অপরিমেয় শক্তি জগৎকে ধ্বংস করে দিতে পারে। শুধু ভোগতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়পরতার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কামনার তাড়নায় অন্ধ হয়ে শুভাশুভ বোধ হারিয়ে তা মহাবিপর্যয় ঘটিয়ে বসতে পারে। শূদ্রের অপরিমেয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে শিবশক্তির দ্বারা। 'মর্দন' শব্দের অর্থ বিনাশ নয়, দমন। শূদ্রশক্তির নাশ নয়, শূদ্রশক্তিকে শিবশক্তির দ্বারা দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে। এ দমনের কাজে শিবশক্তির সহযোগী শক্তি ঐক্যশক্তি, অর্থশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বীর্যশক্তি। সুনিয়ন্ত্রিত শূদ্রশক্তি জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করতে সমর্থ। শূদ্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ঐক্যশক্তি, অর্থশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বীর্যশক্তির দ্বারা, যার পেছনে থাকবে সামগ্রিক কল্যাণশক্তির প্রেরণা। সেই অবস্থাটিই রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও

উৎকর্ষের জন্য 'আদর্শ'।

আরেকটি দিক দিয়েও বিষয়টিকে দেখা যায়। যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনবল, অর্থবল, জ্ঞানবল ও বাহুবলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যে এ বল চারটি বর্ণে বিভক্ত-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চতুর্বণের এ বিভাজন ভেদাত্মক নয়, কর্ম ও গুণাত্মক। আবার কোনোটি কোনোটির নিরপেক্ষ নয়। একে অন্যের সহযোগী ও পরিপূরক। বস্তুত, একটি 'আদর্শ' রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো সেটি, যেখানে ব্রাহ্মণ্যশক্তির জ্ঞান, ক্ষাত্রশক্তির শৌর্যবীর্য, বৈশ্যশক্তির সম্পদ ও সম্প্রসারণশীলতা এবং শূদ্রশক্তির শ্রম ও দৈহিক শক্তি সংহত বা ঐক্যবদ্ধ বা সমন্বিত। লক্ষণীয়, এখানে সরস্বতী, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, মহিষাসুর ও গণেশ প্রত্যেকে স্ব-স্ব তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত এবং সবকিছুর মূলে উপস্থিত অবশ্যই শিব ও দুর্গা। এভাবে পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার ভাবনায় যেন সুস্থ সমাজ, সুস্থ জাতি ও সুস্থ রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিতই আমরা পাই। প্রসঙ্গত, ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'দেবীসূক্তে' দেবী নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করছেন-'অহং রাষ্ট্রী আমিই বিশ্বভুবনের সম্রাজ্ঞী। জগ-ৎরূপ রাষ্ট্রের আমিই কর্ত্রী।'

দেবীর বাহন সিংহ। প্রবল পরাক্রান্ত মহিষরূপী অসুরের মর্দনের জন্য দেবীর বাহন সিংহ হওয়াই তো স্বাভাবিক, যার এক মুষ্টাঘাতেই বিশাল মহিষের মস্তক চূর্ণ হয়ে যায়। কামরূপী মহিষকে পর্যুদস্ত করার জন্য বীর্যরূপী পশুরাজ কেশরীকেই তো প্রয়োজন। কামরূপী মহিষাসুর তমোগুণের প্রতীক। পৌরুষ ও বীর্যের শক্তিতে দীপ্তিমান সিংহ রজোগুণের প্রতীক এবং জ্ঞানময়ী দুর্গার মধ্যে সত্ত্বগুণ কায়াবতী। তমোগুণকে দমন করার জন্য প্রয়োজন রজোগুণ, আবার রজোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সে জন্যই মহিষাসুরের উপরে সিংহ এবং সিংহ আবার দেবীর চরণাশ্রিত। যেখানে অবিমিশ্র তমোগুণ সেখানে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তমোগুণ যখন রজোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখন বিপর্যয়ের গতি হয় রুদ্ধ। কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তখনো তিরোহিত নয়। বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নির্মূল হয় তখনই যখন রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সেখানেই সাধকের গতির যতি নয়। কারণ, সাধকের লক্ষ্য সংসারবন্ধনের মূলোচ্ছেদ। অপকর্ষ ও উৎকর্ষের বিচারে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বের উত্তরোত্তর ব্যবধান থাকলেও সাধকের লক্ষ্য তিন গুণের সীমাকে অতিক্রম করা। কারণ, গুণত্রয়ই সংসারবন্ধনের মূল। অতএব, শুধু তমঃ ও রজঃ গুণের ঊর্ধ্বে ওঠাই যথেষ্ট নয়, সত্ত্বগুণের সীমাকেও অতিক্রম করতে হবে। সংসারবন্ধনের নিবৃত্তি এবং সাধনার সমাপ্তি হয় তখনই যখন সত্ত্বগুণের লেশটুকুও অন্তর্হিত হয়। দেবী শুদ্ধসত্ত্বময়ী। তিনি তার রজোগুণান্বিত বাহন সিংহের মাধ্যমে তমোগুণাচ্ছন্ন মর্তপীড়ক মহিষাসুরকে নির্জিত করেছেন। মর্তে দ্বন্দ্ব থেমেছে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শিব বা নিত্য কল্যাণের প্রতিষ্ঠা? তার জন্য প্রয়োজন দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে উত্তরণ। সমস্যার স্থায়ী সমাধান শুধু সেখানেই। কারণ, যে ভূমিতে দ্বন্দ্ব, সেই ভূমিতে স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। দ্বন্দ্বাতীত সেই ভূমি হলো ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধির ভূমি। -বাকী ১৮ পাতায়

রাজেশ্বরী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী

দুর্গাপূজাঃ কল্যাণের আলো

সেলিনা হোসেন

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। শরৎকালের এই উৎসবের যে সার্বজনীনতা রয়েছে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন করে নিষ্প্রয়োজন। আমার 'বাংলাদেশের উৎসব' শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমি স্পষ্টতই মনে করি, উৎসব মানবিক আবেগের আনন্দঘন এক সার্বজনীন বহিঃপ্রকাশ। এক অর্থে সভ্যতা শুরুর সঙ্গে উৎসবের যোগসূত্র নিবিড়। উৎসব মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন, 'উৎসবের দিনে আমরা সত্যের নামে বৃহত্তর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। ... সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলোর মুকুটমণি স্বরূপ করিয়া তুলি।' বলতে পারি, বাংলাদেশের উৎসব বাঙালির জীবনেও মুকুটমণি স্বরূপ।

আমার স্মৃতির অমূল্য সঞ্চয় ছোটবেলার ঈদ ও পূজার আনন্দ। উৎসবের আনন্দস্মৃতিটুকু হারায়নি। এখনও তীব্র আলোয় জেগে ওঠে সেই স্মৃতির অনির্বাণ শিখা। দুর্গাপূজায় আমাদের বিশেষ আনন্দ ছিল শিউলি ফুল কুড়ানো। নদীর ধারে ছিল গোঁসাইর আখড়া। সেই আখড়ার বিশাল আঙিনার দেয়াল ঘিরে ছিল কয়েকটি বকুলগাছ। সেসব গাছের পাশেই ছিল শিউলি ফুলের গাছ। আমার শৈশবে ঈদের মতো পূজাও ছিল ভীষণ আনন্দের। ওই আনন্দস্মৃতি এখনও ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবে। এ কথা শিখেছিলাম, ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের মিলনের বার্তা। আর এর নিরিখেই বলতে পারি, ধর্মকে ব্যক্তির বিশ্বাস থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনা কোনো গণতান্ত্রিক সুস্থ বোধসম্পন্ন দেশে ঘটতে পারে না। এটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর আঘাত, ধর্মীয় বোধের ওপর আঘাত। মনে রাখা দরকার, মানুষের সহমর্মিতা মানুষকে শক্তি দেয়।

দুর্গাপূর্জা শুধুই পূজা নয়, উৎসবও। ঋতুর দিক থেকে শরৎ অত্যন্ত মনোরম ঋতু। প্রকৃতিতে বিরাজ করে স্নিগ্ধ আমেজ। এ উৎসবে শুধু পারিবারিক বন্ধনই নয়, দৃঢ় হয় সামাজিক বন্ধনও। দুর্গাপূজার মূল বাণী- মানুষের মঙ্গল। অমঙ্গল দূর করা। যে দুর্গার প্রতিমা আমরা দেখি, তিনি অসুরবধকারিনী। ধর্মের এই মূল সুরটুকুই মানবজীবনের বড় দিক। কল্যাণের-মঙ্গলের মধ্যেই তো নিহিত আছে বেঁচে থাকার অর্থ।

মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি কেন মানুষ হিসেবে হবে না? কেন ধর্ম কিংবা অন্য কোনো বিষয় মানুষের পরিচয় মুছে দিয়ে বড় হয়ে উঠবে? কেন হীনস্বার্থ সিদ্ধির কারণে এক দল তাড়া খেয়ে ছুটবে খানিকটা আশ্রয়ের জন্য? মনে পড়ছে একটি গানের কয়েকটি কলি- 'সংখ্যালঘু কোনো সম্প্রদায়ের/ ভয়ার্ত মানুষের না ফোটা আর্তনাদ/ যখন গুমরে কাঁদে/ আমি যেন তার নিরাপত্তা হই ...।' এই গান শুনলে অদ্ভুত এক কালো পর্দা নেমে আসে মনের ওপর। আমরা সব ধর্মের উৎসব নিজেদের মনে করে ঐক্যের পতাকাতলে দাঁড়াতে চাই। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করলাম। এবারই বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীও। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। তারই ডাকে-নেতৃত্বে একাত্তরে রক্তগঙ্গা পেরিয়ে আমরা পেলাম এই রক্তস্নাত বাংলাদেশ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। গোটা জাতিকে একতাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের মতো মহান অধ্যায় রচনায় রাজনীতির এই কবির নেতৃত্বে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তা বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য নজির।

আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা, দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের নাগরিক। এখানে অধিকারের ভূমি অসমতল থাকতে পারে না। মানুষের সহমর্মিতার শক্তির জায়গাটুকু আমাদের নাগরিক সমাজে আছে। অশুভ শক্তি কখনও কখনও তা বিনষ্ট করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রগতিমনা মানবিক মানুষ তা রুখে দিয়েছে তাদের যূথবদ্ধ অঙ্গীকারে। মানবিকতা হোক আমাদের একমাত্র আশ্রয়। মানুষের কল্যাণ হোক আমাদের ধর্ম। এ দেশের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে, অশুভর প্রতিরোধের পথে নেমে মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে চায়। সুস্থ প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন রাষ্ট্রই দেশের শুভবোধ সম্পন্ন সবার কাম্য। এই বিষয়গুলো যতক্ষণ নিশ্চিত থাকবে, ততক্ষণই আমরা সবাই ভালো থাকব। সবার অধিকার থাকবে সমুন্নত। প্রতিটি উৎসবের অংশীজন হবো আমরা। জয় হোক মানবতার। শারদীয় দুর্গোৎসব কল্যাণের আলো ছড়াক।

লেখকঃ কথাসাহিত্যিক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

১৬ অক্টোম্বর ২০২৬, ৩১ আশ্বিন বাংলা ১৪৩৩

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

সার্বজনীন মঙ্গল উৎসব

বাঙালি সংস্কৃতি এই বাংলার জল, মাটি, পলি, মানুষ- এসব কিছুর সম্মিলন থেকেই উঠে এসেছে। এই উঠে আসার মধ্য দিয়ে আমরা চিনেছি বাঙালি সংস্কৃতি। মূলত এখানে বসবাসকারী মানুষদের, যাদের আমরা বলি আদি বাঙালি সমাজ কিংবা তার পরের যুগের বাঙালি কিংবা আধুনিক বাঙালি এবং সাম্প্রতিক সময়ের বাঙালি। এই প্রক্রিয়া ধারার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করি, মানুষ তার ভাষায়, আচার-আচরণে, তার বিশ্বাস এবং তার সম্পর্ক এসব কিছু মিলিয়ে কোন কোন পদ্ধতিতে তারা জীবনযাপন করছে। একটা পদ্ধতি হলো, যেখানে জন্ম নিয়েছে তারপর সেখানে তার বসবাস, ভিটাবাড়ি এরপর তার অনেক সংস্কার। সংস্কারের পাশাপাশি তার আছে সংস্কৃতি। এই সংস্কার তার সামাজিকতায়, বিশ্বাসে, আচরণে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে, নানাভাবে।

এর মধ্যে কিছু আছে সার্বজনীন, যে বিষয়গুলো ধর্ম-বর্ণ সবকিছু ছাড়িয়ে প্রকৃতিনির্ভর, আমাদের অরণ্যনির্ভর, সমাজ কাঠামোর বন্ধননির্ভর এবং আমাদের মানবিক সম্পর্কনির্ভর। তেমনি এক ঋতু-ভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক, আচারভিত্তিক এবং সার্বজনীন মঙ্গলভিত্তিক একটি উৎসবের নাম শারদীয় দুর্গোৎসব। এর সঙ্গে জড়িত আছে আদি বা সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালি বিশ্বাস, দেব-দেবীর পূজা অর্চনা এবং মানুষের মাঙ্গলিক সত্তা। দেব-দেবীকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা করেন। তারা দেব-দেবীর আরাধনা করেন। এই বিষয়গুলো হয় নানাভাবে। কখনও মূর্তি আকারে স্থাপন করে আবার কখনও কোনো আকারে না গিয়ে নান্দনিক আকারবিহীন সত্তার ভেতর দিয়ে দেখে। পার্থক্য শুধুই এটুকুই। বাকি যেটুকু তা হলো, মানুষে মানুষে সম্পর্কিত সত্তা, বন্ধন, ভালোবাসা, প্রীতির ছায়া। বাঙালি জাতির বৈচিত্র্যময় জীবনাচার, সংস্কৃতি সবকিছুই তো অত্যন্ত উৎকর্ষ। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও একই সঙ্গে যে সংস্কৃতি ধারণ করে চর্চা করে চলছে বাঙালি, এর মধ্যে সার্বজনীনতাই সবচেয়ে বড় বিষয়। শরৎ

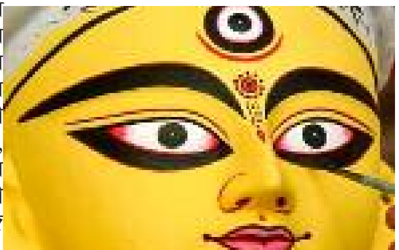

আমাদের ষড়ঋতুর মধ্যে এমন একটি ঋতু, যে ঋতুতে গরম কম, এই রোদ কিংবা এই বৃষ্টি কিংবা জল আছে কিন্তু জলও কম আবার শীত আছে কিন্তু তাও কম। অর্থাৎ, সবচেয়ে সহনীয় একটা ঋতু। আমাদের প্রকৃতিগত এই পরিবর্তন ঘিরে বাঙালি সমাজে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো বাঙালি সমাজে আধিবাসীদেরও বসবাস। সনাতন ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এমনকি আদিবাসী সবাইকে নিয়েই তো আমাদের সম্প্রীতির সমাজ কাঠামো। আদিবাসীদের জীবনাচারে প্রাকৃতিক বিষয়গুলো খুব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আমাদের সবারই এই কাঠামোবদ্ধ সমাজে বসবাস কিংবা জীবন-যাপন এসব ঘিরেই নান্দনিকও। আমাদের আদিতে আছে কৃষি সভ্যতা। কৃষি সভ্যতার সঙ্গে বাঙালি সভ্যতার, বাঙালির আচার ইত্যাদির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ধান, দূর্বা, ফুল, জল ইত্যাদি কত কিছুই তো প্রকৃতির উপাদান। আমরা যখন পবিত্র জল ছিটাই কিংবা গঙ্গা থেকে পবিত্র জল আহরণ করি, সবকিছুতেই উদারমনস্ক বাঙালিরা সুন্দর ও স্বচ্ছতারই অনুসন্ধান করে।

যদিও একটি সম্প্রদায় কিংবা ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বলা যায় এই শারদীয় দুর্গোৎসব, কিন্তু এই উৎসবের সার্বজনীন ও মাঙ্গলিক দিক আছে যা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার, সম্প্রীতির বন্ধন মজবুত করার বড় সূত্র। তেমনি বুদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা, খ্রিষ্টানদের বড়দিন, মুসলামনদের ঈদ এই প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এর সার্বজনীনতাও এখানে গভীরভাবে দৃশ্যমান। সব ধর্মের মধ্যেই এই মাঙ্গলিক সার্বজনীন বিষয়টি রয়েছে। আমরা সম্প্রীতির বন্ধন আরও মজবুতকরণের বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্ব দিই। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও ডাকে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এই আকুতি আরও পুষ্ট হয়েছে। আমাদের মাঙ্গলিকতা ও মিলনের সেতু হলো এই বোধটুকুই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শারদীয় উৎসব নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা যেমন সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন চাই, তেমনি চাই মঙ্গল কিংবা কল্যাণের ক্ষেত্রও আরও প্রসারিত হোক। ক্রমাগত হতেই থাকুক। এই জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারগুলো ছিল, সেই অঙ্গীকার ধারণ করে, চর্চা-অনুশীলন করে সব অশুভর ছায়া অপসারণ করা সম্ভব। আমাদের সংস্কৃতি সব উৎসবের ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। উৎসবের আলোয় আলোকিত হোক চারদিক।

লেখক : মুহম্মদ নূরুল হুদা,বিশিষ্ট কবি; মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmobhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

চেতনায় দুর্গোৎসব

যতীন সরকার

বাঙালি সংস্কৃতিতে উৎসবের নানা মাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও রূপ নিয়েছে উৎসবে। দুর্গোৎসব তেমনই। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর অন্যতম ধর্মীয় কৃত্য। বাঙালির ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরও মর্মমূলে নিহিত আছে ধর্মনিরপেক্ষ অন্তঃসার, তার ধর্মীয় উৎসবও সর্বজনীনতার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং সদা গতিশীল ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদী। সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধে আক্রান্ত সমালোচকরা যাই বলুন, সুস্থ বাঙালি সংস্কৃতি সাধকদের কেউই সাম্প্রদায়িক হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা মুসলমান নন; তারা কেবলই মানুষ। বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা আমাদের জীবনে কখনও কখনও বড় ক্ষতির কারণ হয়েছে বটে কিন্তু প্রগতিমনা মানুষদের যূথবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর কারণে এর নিরসনও ঘটানো গেছে।

দিনে দিনে এই উৎসবে যুক্ত হচ্ছে আধুনিক মাত্রা। বিগত পাঁচ দশকে বাঙালির সমাজজীবনে ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তাল রেখে দুর্গোৎসবের দৃষ্টিভঙ্গি ও এর বহিরঙ্গীয় বিন্যাসে কত যে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে এবং এসবের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য যে কত গভীর তা পর্যালোচনার অবশ্যই বড় বিষয়। দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও নজরুল বাংলার এই তিন কবি-সাহিত্যিক কিংবা বলা ভালো, দিকপালের ভাবনার কথা স্মরণ করতে চাই। ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিচারে তারা কেউই সনাতন ধর্মাবলম্বী নন। একজন খ্রিষ্টান, একজন ব্রাহ্ম, একজন মুসলমান। তাদের 'অহিন্দু' পরিচয়ে অনেক সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্য-সমালোচক খুবই আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু এই তিনজনকেই তাদের সৃষ্টি রচনা বড় মানুষ হিসেবে, অনন্য মানুষ হিসেবে, অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস' ও 'বিজয়া-দশমী' দুর্গোৎসব স্মৃতি নিয়ে রচিত। এই স্মৃতি কোনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ করেনি, সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। 'খ্রিষ্টান' মধুসূদনের মতো 'ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক।

শরৎকালের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন 'আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।' একই সঙ্গে তিনি এও দেখেছেন, 'ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে কাঙালিনী মেয়ে'। পূজার দিনের প্রত্যুষে উৎসবের হাসি-কোলাহল শুনতে পেয়ে নিজের নিরানন্দ ঘর ছেড়ে কাঙালিনী মেয়েটি ছিন্ন মলিন বসন পরে ধনীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকের ঐশ্বর্যরাশির মধ্যে এই হলো বড় অসংগতি। রবীন্দ্রনাথ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি/ জননীরা আয় তোরা সব,/ মাতৃহারা মা যদি না পায়/ তবে আজ কিসের উৎসব! ... তবে মিছে সহাকার-শাখা/ তবে মিছে মঙ্গল কলস।'মাতৃপূজার অনুষ্ঠান যদি মায়ের সন্তানদের প্রতি সক্রিয় স্নেহমমতার উদ্বোধন ঘটাতে না পারে, তবে তা নিতান্তই জড়ো আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকবে। স্মরণ করি কবি নজরুলকে। কবি নজরুল ইসলাম সর্বজনীনতার আরও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন মুসলমানত্বের কোনো ব্যত্যয় না ঘটিয়েই। তিনি বাঙালিত্বকে সমগ্র সত্তায় ধারণ করেছেন। বাঙালির দুর্গোৎসবে দেশের সংকটকালে দুর্গাদেবীকে কবি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ জানান- 'আর কতকাল থাকবি, বেটী মাটির ঢেলা মূর্তি আড়াল?/ স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।' তৎকালীন শাসকরা বুঝেছিল তার এই উচ্চারণের সমার্থ। আর এর জন্যই রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দেওয়া হয় কারাদণ্ড।নজরুলের এই কবিতা ও এর জন্য তার দণ্ডলাভ বাঙালির দুর্গোৎসবে আরও একটি নতুন মাত্রায় যোগ করল। পৌরাণিক কাহিনির রাম-রাবণের যুদ্ধের নতুন এক তাৎপর্যও তিনিই তুলে ধরেন। তার মতো 'সীতা' হচ্ছে শস্য, আর 'রাবণ' হচ্ছে সেই লোভী ধনিক যে কৃষকের উৎপাদিত শস্য হরণ করে নিয়ে যায়। আর 'রাম' হচ্ছেন কৃষকনেতা যিনি অত্যাচারী ও শোষক 'রাবণ'কে উৎখাত করার শক্তিলাভের বাসনাতেই অকালবোধনে মহাশক্তি দুর্গাদেবীর পূজা করেন। রামায়ণের অন্তর্গত বিভিন্ন আখ্যান ও বর্ণিত চরিত্রের যে তাৎপর্য নজরুল উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনটি তার আগে কারোর চিন্তাতেই আসেনি।

রামচন্দ্র যে দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন; এর মর্মার্থ আমরা ক'জন মনে রেখেছি, ধারণ করেছি? দুর্গাপূজা মানেই হচ্ছে নিজের ভেতর সেই শক্তির সঞ্চার ঘটানো, যে শক্তি দিয়ে সব অপশক্তি প্রতিহত ও নির্মূল করা যায়। এ কালের রাবণদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব বর্তেছে আমাদের ওপর, প্রজন্মের ওপর- এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। দুর্গোৎসবের সর্বজনীন ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনুধাবন করে এই উৎসবকে যথার্থ সার্থক করে তোলা সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনে যূথবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতেই হবে। দুর্গোৎসবের চেতনা ধারণ করে আমরা সেই শিক্ষাই লালন করব। সবার কল্যাণে সবাই থাকব নিবেদিত।

শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক

জেনারেল আজম খানের দেবী দুর্গাচর্চা

সুমন পালিত

দুর্গাপূজা বসন্তকালের। কিন্তু সে পূজা বাঙালি হিন্দুরা পালন করেন শরৎকালে। অন্তত সাড়ে ৫ শ বছর ধরে। বাংলা ছাড়া হিন্দি তামিল গুজরাটি মারাঠিসহ অন্য সব ভাষাভাষী হিন্দুদের কাছে দেবী দুর্গার তেমন গুরুত্ব নেই। অনেকে দুর্গা দেবীর নামও জানেন না। বলা হয় অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তার কোনো পুত্র ছিল না। দেবতার আশীর্বাদে তিন স্ত্রীর গর্ভে তিনি চার পুত্র সন্তানের বাবা হন। রানি কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নেন রাম। কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং ছোট রানি সুমিত্রার গর্ভে জন্ম নেন যমজ সন্তান লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন।

দশরথের তিন রানির সম্পর্ক ছিল বেশ ভালো। একে অপরের সহযোগী ছিলেন তারা। কিন্তু রানি কৈকেয়ী তার দাসীর কথায় রাজা দশরথের কাছে দুটি বর চান। রাজা তাতে রাজি হন। রানি কৈকেয়ী বলেন, প্রথম বর হলো দশরথের পর ভরত হবেন অযোধ্যার রাজা। আর দ্বিতীয় বর রামকে ১৪ বছর বনবাসে পাঠাতে হবে। দশরথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নেন। রামকে স্ত্রী সীতাসহ পাঠানো হয় বনবাসে। পুত্র শোকে ছয় দিনের মধ্যে রাজা দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাম বনবাসে গিয়ে পড়েন মহা বিপদে। লঙ্কার রাক্ষস রাজ রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। রাবণ ছিলেন অসীম সাহসী বীর ও শক্তিশালী রাজা। তাকে বধ ছাড়া রামের পক্ষে সীতাকে উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। কীভাবে স্ত্রীকে উদ্ধার করবেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় ব্রহ্মা তাকে শিবের স্ত্রী পার্বতীর পূজা করার পরামর্শ দেন। ব্রহ্মার পরামর্শে অসময়ে শরৎকালে পার্বতীর দুর্গতিনাশিনী রূপের মহাপূজার আয়োজন করেন রাম।

মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধি পূজা করেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায় ১০৮টি নীল পদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন তিনি। হনুমান রামকে ১০৮টি নীল পদ্ম জোগাড় করে দেন। কিন্তু পূজার আগেই ঘটে মহাবিপত্তি। মহামায়া রামকে পরীক্ষা করতে একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। সে পদ্মের বদলে রাম নিজের চোখ উপড়ে দেবী দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে তিনি নিজে এসে কাঙ্ক্ষিত বর দেন। দেবী দুর্গার পূজা করে বর আদায় এবং সে শক্তি বলে রাবণ বধের কেচ্ছাকাহিনি নিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ভগবান রামচন্দ্রেরজীবনী বলে বিশ্বাস করা হয় বাল্মিকীর রামায়ণকে। রামায়ণ অনুবাদ হয়েছে ৩৮টি ভাষায়। এর মধ্যে ৩৭টিতে রামের দুর্গাপূজা করে বর আদায়ের কেচ্ছা নেই। আছে শুধু কৃত্তিবাস ওঝার অনূদিত রামায়ণে। কৃত্তিবাস রামায়ণের পদ্যানুবাদের সময় মনের মাধুরী মিশিয়ে রামের দুর্গাপূজার বিষয়টি যে সংযোজন করেছেন তা স্পষ্ট। বলা যায় রামের নয়, বাঙালি হিন্দুর দুর্গোৎসবের সব কৃতিত্ব কৃত্তিবাস ওঝার। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, রাম নামের কেউ ছিলেন কি না এমন সন্দেহভাজন হিন্দুর সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। পশ্চিম বাংলার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাদেরই একজন। অযোধ্যার রামমন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্কের সময় তিনি বলেছিলেন, যেখানে রাম নামের কেউ কখনো ছিলেন না সেখানে রামমন্দির থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

রাম সম্পর্কে আরেকটি তথ্য বেশ চমকপ্রদ। শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, লওস ও তিব্বতের লোক কাহিনিতে রয়েছে রামের উপস্থিতি। যেসব দেশের মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। তবে অযোধ্যায় রামের সঙ্গে ওইসব দেশের রাম কাহিনির পার্থক্য রয়েছে।

থাক সে কথা। দুনিয়ার সব ধর্মের ক্ষেত্রে অভিন্ন একটি মত হলো বিশ্বাসে মেলে বস্তু তর্কে বহুদূর। কোটি কোটি বাঙালি হিন্দু যে শারদীয় দুর্গাপূজার জন্য সারা বছর মুখিয়ে থাকেন তা একটি মহাসত্যি। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর সর্বজনীন উৎসবের নাম। এই উৎসব নিয়ে বিতর্ক অনুদারতার শামিল। ব্রিটিশ আমলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। সারা ভারতের অভিজাত পরিবারের বসবাস ছিল কলকাতায়। সপ্তাদশ শতাব্দীতে কলকাতার ধনিক শ্রেণি বিশেষত জমিদারদের মধ্যে ঘটা করে দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু হয়। এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। ১৭৮৪ সালে নীলমণি ঠাকুরের হাত ধরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুরদের পূর্বপুরুষরা খুলনার অধিবাসী। ঘটা করে দুর্গাপূজার শুরু নীলমণি ঠাকুরের সময়ে। তবে দুর্গাপূজা ঠাকুরবাড়িতে রাজসিক রূপ নেয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কৃতিত্বে।

নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র দ্বারকানাথের জীবনাচার ছিল রাজা-মহারাজার মতো। দেব-দেবীর পূজাও করতেন ভক্তিভরে। ইংরেজদের সঙ্গে দ্বারকানাথের হরহরি আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে অচিরেই। আগে থেকেই ঠাকুররা ছিলেন ফরাসি ও ইংরেজদের সঙ্গে নানা ব্যবসায় জড়িত। সাহেবী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তারা। দ্বারকানাথ ছিলেন তার বাবা ও ঠাকুরদার চেয়ে অনেক এগিয়ে। ফলে ধার্মিকরা তাদের দেখতেন বাঁকা চোখে। ধর্ম বিশ্বাসে উদার হলেও দ্বারকানাথের সময় ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা হতো রাজকীয় কায়দায়। এ বাবদ যে খরচ হতো তা ভিরমি খাওয়ার মতো। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হতো ঠাকুরবাড়িতে। কর্মচারীদের সবাইকে নতুন পোশাক কেনার অর্থ দেওয়া হতো। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্য **(বাকী অংশ ১৮ পাতায়)**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

নিউইয়র্ক, আয়োজিত শারদীয় দুর্গা পূজায় সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Provat C. Das, M.D.

Provat C Das, M.D.
Parkchester Medical Service of New York.
Parkchester Medical Service Of New York
Located at 1211 White Plains Road, Bronx, New York.
We have been providing excellent Medcal Service to the Community in the same location over 20 years
Dr. Das is a Board Certified Physician Specializing in Internal Medicine. Dr. Das is very active in the Bengali Community as you recognize his name.

We Are a Fully Electronic And Digital Office
Access To Your Medical Record Is Fast Easy And Efficient

Bring Entire Family
Dr. Das can care for the Parents and Grandparents !!!

For Your Convenience, We Have All of The Following on The Premises:

- *Lab*
- *Cardiology*
- *Physical Therapy*
- *Internal Medicine*
- *Podiatry*
- *Asthma And Breathing Problems*
- *Urology*
- *Immunizations*
- *Diabetes Care*
- *Pulmonary Funcion Testing*
- *Physicals*
- *Orthopedics*
- *Pulmonology*
- *Gastroenterology*
- *Ultrasound/ekg/echo*
- *Pediatrics*

আমরা বাংলায় কথা বলি

Our Location
Parkchester Medical Service Of New York
Ask for Dr. Das and make an ***Appointment***
1211 White Plains Road, Bronx, New York 10472

Please Call Our Office At
718-828-6610
Ask For Dr. Das And Make an ***Appointment***
Dr. Das Has Saturday and Weekday Evening Hours For Your Convenience

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

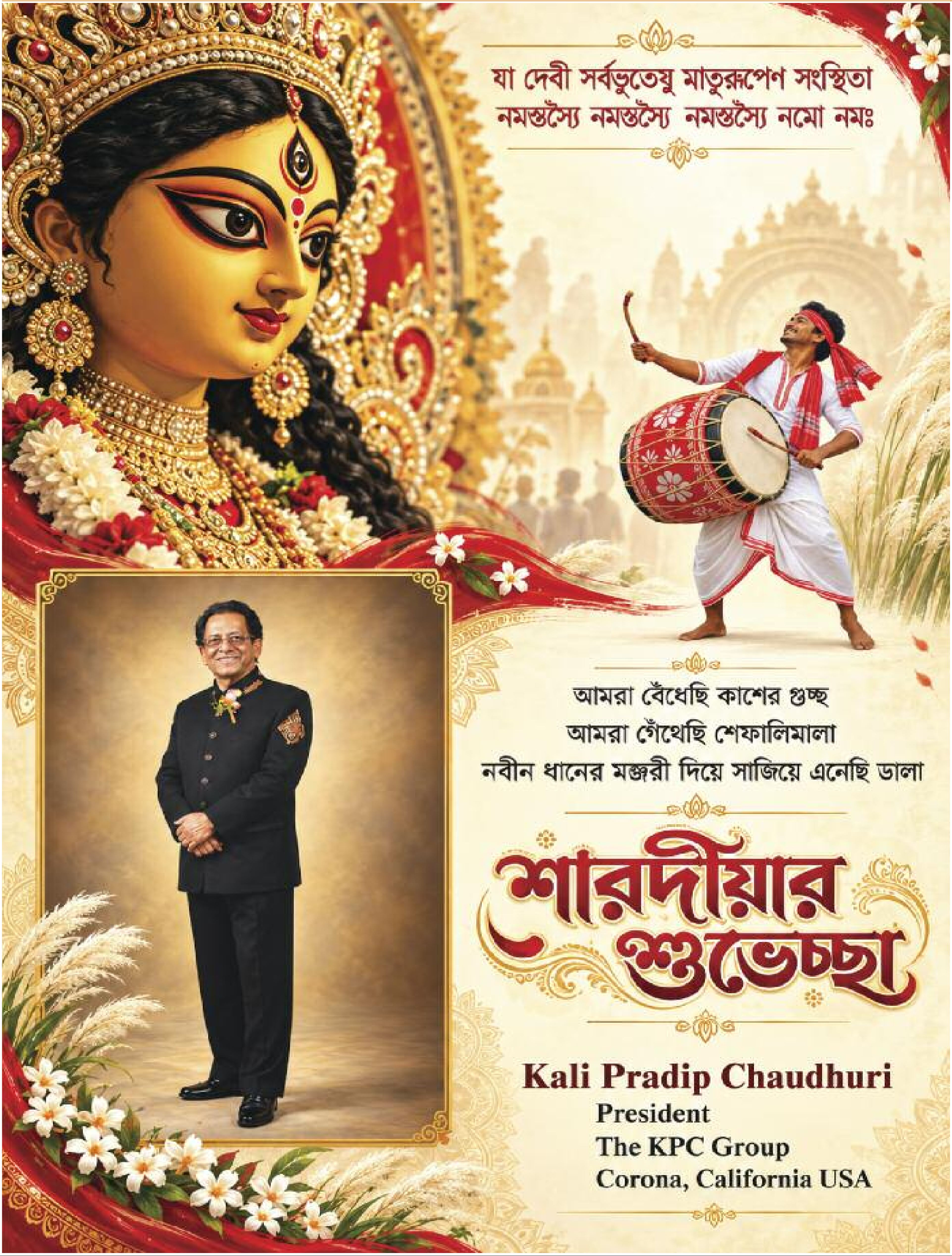

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

In Loving Memory of Sunanda Chaudhuri

We are deeply saddened by the passing of Sunanda Chaudhuri, beloved wife of Dr. Kali Pradip Chaudhuri. On behalf of Weekly Janmobhumi, we extend our heartfelt condolences to Dr. Chaudhuri, their family, friends, and loved ones.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

আমার পূজা আমার গৌরব

অবিনাশ চন্দ্র আচার্য্য

সনাতন ধর্মীরা অনাদিকাল থেকে পূজা-পার্বণ করে চলেছে– পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে। এক কথায় পূজা হলো সনাতনধর্মীদের ঐতিহ্য ও প্রারম্ভিক কল্যাণের ফল্গুধারা। দুর্গাপূজা সনাতনীদের প্রধান উৎসব। এক সময়ে অসুরদের অত্যাচারে দেবলোক ও আমাদের গৃহিনী সাধু-সজ্জন এবং সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা অত্যাচার অবিচার হতে মুক্তির জন্য ব্রহ্মাচারে মগ্ন হলেন। ভগবান ব্রহ্মা তাদের ধ্যানে সাড়া দিয়ে সকল দেবতাদের শক্তি একত্রিত করে এক রমণী সৃষ্টি করেন অসুর নিধনের জন্য। এই রমনীই হলেন মা দুর্গা। তিনি দক্ষ রাজার কন্যা হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র রাবন বধের পূর্বে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করেন। সেই অকাল বোধন শারদীয় পূজাই বর্তমানে বাঙালি সমাজে সমাদৃত। বৈদিক পুরাণ মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে কুন্তীপুত্র মহাবীর অর্জুনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা সম্পাদন করেন। মা দুর্গার ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যায় মা দুর্গা হলেন অনাদির আদি। মা দুর্গা সমস্ত ভারতীয় দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রদ্ধেয়, সর্বাধিক পূজিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ঐশীজাতির প্রতীকী রূপ। হিন্দু সম্প্রদায় তথা সনাতনীরা নিরাকার ভগবানকে ভক্তির মাধ্যমে চিন্ময়ী রূপে পূজা করে থাকে। মহালয়া থেকেই দুর্গাপূজা শুরু হয়ে যায়– যা দেবী সর্বভূতেষ শক্তি রূপেন সংস্থিতা, নমস্তেস্যই নমস্তস্ব্যই নমঃ নমঃ। এই মন্ত্রপাঠে মা দুর্গার আগমন বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। মা দুর্গার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে জানতে পারি এই বাংলার মাটিতেই দুর্গা পূজার সূচনা হয়েছিল প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এবং নদীয়ার ভবানন্দ বাংলায় প্রথম শারদীয়া বা শারৎ দুর্গাপূজা সংগঠিত করেন। এরপর রাজাবাই চট্টগ্রামের রাজা জমিদার গন সম্পাদন করেন। নিয়ম করে বাঙালি সমাজে দুর্গাপূজা সমাদৃত হয়। বাঙালির প্রাণরক্ষার সবচেয়ে শক্তির উৎসব দুর্গাপূজা। যতবার আমরা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছি বা হই ততবার দুর্গা এসে আমাদের পথ দেখায়। মনে পড়ে সেই ১৯৭১ সালের যুদ্ধের কথা। সেবার বাংলাদেশে কোন পূজা হয়নি। আমি তখন মেঘালয়ের তুরা ট্রেইস ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কুমিল্লা-বসবা সীমান্তে সি.এন.বি রোড সংলগ্ন নারুই (নারায়ণপুর) গ্রামে ঘুরে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। অক্টোবর মাস পূজা দেখার জন্য আমি আগরতলা সোনাইমুড়ি ক্যাম্পে চলে আসি এবং আগরতলা রাজবাড়ী এবং আশপাশ কিছু পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখি। তখন আগরতলা বাংলাদেশী শরণার্থীদের ভিড়। ধান ভানতে শিবের শিবের গীত গাইতে হবে একটু। শরণার্থীর সিংহ ভাগ ছিল অত্যাচারিত নিঃস্ব, অনেকে স্বামীহারা পুত্রহারা স্ত্রী হারা। তবু অঞ্জলি দিতে মায়ের কাছে ছুটে আসে। তাদের আকুতি-মিনতি মা দুর্গা শুনেছেন। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। অধুনা বাংলার আকাশে মেঘের ঘনঘটা, আকাশ-বাতাস-শয়তানদের দখলে। আমরা আবার অস্তিত্ব সংকটে। আসুন দেশে প্রবাসে কায়মনোচিত্তে ভক্তি ভরে মা দুর্গার পূজা করি এবং ঐকতানে বলি– মা দেবী, সর্বভূতেষ শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তৈস্য নুমস্তেস্যহ নমস্ত===

হিন্দু সমাজে পূজা বিশেষ করে দুর্গাপূজার প্রভাব খুবই বেশি। বৃটিশ ভারতে স্বামী বিবেকানন্দ এক পূজা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন– সনাতনধর্মীদের পূজা পার্বন দ্রুত আধুনিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতে সারাবিশ্বে সনাতনীরা এগিয়ে যাবে। আর এই কঠিন সত্যে পরিণত হইয়া অধুনা আবুধাবী সহ সারা বিশ্বে দুর্গাপূজার ধুমধাম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের নিউইয়র্কে এবার প্রায় ত্রিশটি দুর্গাপূজার হবে। গত বৎসর টাইম স্কয়ারে দুর্গাপূজায় সারাবিশ্বের মানুষ উপচে পড়ে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই দুর্গোৎসবে অংশীদার হতে পেরে। জ্যাকশন হাইটসে উন্মুক্ত পরিবেশে গত বৎসর এবং এ বৎসরও পূজার আয়োজন চলছে। উদ্যোক্তাদের অভিবাদন জানাই। ১৯৯৫ সনে আমি নিউইয়র্কে আসি। তখন মাত্র ২/৩টি পূজা মণ্ডপ ছিল। তখন আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন রতন তালুকদার.শ্যামল চক্রবর্তী, বিভাস দে, শিতাংশু গুহ, নবেন্দু দত্ত, ডঃ দ্বীজেন ভট্টাচায, ডা সলিল বর্মন, ডা. দেবব্রত দত্ত, প্রবীর রায়,ভজন সরকার,দীপক কর্মকার মহুয়া দত্ত, নৃপতি রায় নিপু এবং আমি একটি মন্দিরের উদ্যোগ নিয়েছিলাম–বর্তমান বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির সেই উদ্যোগের ফল। মহামায়া মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় শ্যামল চক্রবর্তী এবং আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ ভত্ত সংঘ মন্দির, ওম শক্তি মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, মহামায়া মন্দির, বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির সহ প্রায় ত্রিশটি মন্দিরে পূজা হবে। বাংলাদেশের অতীতের ন্যায় এবারও মহা ধুমধামে পূজা হবে। প্রার্থনা করি প্রবাসে এবং দেশে সবার শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিময় হোক। সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও সংরক্ষণ

ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

১৮৮১ সালে, ব্রিটিশ আমলে পরিচালিত দ্বিতীয় আদমশুমারিতে দেখা গেল যে, পুরো বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যায় হিন্দুদের চেয়ে বেশি এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে তাঁদের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি, তখন নাকি হিন্দু বিজ্ঞজনেরা অবাক হয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করেছিলেন, “এটা হল কেমন করে!” কোটি কোটি মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হল কেন!” এর কারণ বুঝতে চাইলে বোঝা যায়, কিন্তু সেটা বোঝার কোন গরজ আজও কারও আছে বলে তো মনে হয় না; শুধু আক্ষেপই করতে শোনা যায়। সনাতন ধর্ম একটি চমৎকার ধর্ম, কিন্তু এই ধর্মবলম্বীদের দুটো সমস্যা প্রকট– আমাদের অধিকাংশই আমাদের ধর্মের সারাৎসার বা এসেন্সটা কি জানি না; আর বর্ণাশ্রমের ফসল জাত-পাত প্রথা, যা ক্রিতদাস প্রথা বা বর্ণবাদের মতই সারা বিশ্বে ঘৃনিত। এই সমস্যাদুটোর সমাধানের পথ যে কঠিন তা’ নয়, কিন্তু এর সমাধানের কোন সদিচ্ছা বাংলাদেশে তো নয়ই, ভারতেবর্ষেও কারও আছে বলে আমার জানা নেই। তবে, হ্যাঁ, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত আরেকজন সমাজ সংস্কারকের জন্ম হলেও এই সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা অন্তত: প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতিরেকে করা সম্ভবও নয়। ট্র্যানজেকশন্যাল রাজনীতি বহির্ভূত এই জরুরী কাজদুটো করা অবশ্যিক, যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে।

ধর্ম শিক্ষা: পৃথিবীতে অন্তত: ১০ হাজার ধর্ম আছে, যার মধ্যে দশ-বারোটির অনুসারী বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ। সুপরিচিত ধর্মগুলো হচ্ছে: সনাতন বা হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, জুডাইজম, জৈন ধর্ম, শিন্তো ধর্ম, শিখ ধর্ম, টাওয়িজম, জোরোয়াস্ট্রিয়ানিজম, এবং বাহাই ধর্ম। প্রতিটি জাতি বা নৃগোষ্ঠীই পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার তাগিদে যেমনি একটি করে ৭ হাজার ভাষার সৃষ্টি করেছে অনেকটা তেমনি তাঁদের জীবনের মৌলিক দার্শনিক প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজ নিজ ধর্ম ও সৃষ্টি করেছে। ঐ প্রশ্নগুলো মূলত: হচেছ: এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা কে এবং তাঁর স্বরূপ কী, আমাদের প্রাণের উৎস কী, স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী, মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা কোথায় যাবে,; আর, তা’ছাড়া ইহলোক ও পরলোকে অবিমিশ্র শান্তি লাভের জন্য সঠিক জীবন যাপন পদ্ধতি কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে এ’সকল প্রশ্নের উত্তরে আমার পেয়েছি বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ ভাগবদ গীতা প্রভৃতি, আর অন্য দিকে আব্রাহামিক ধর্মগ্রন্থসমূহ। এ’গুলোর বাইরে কিন্তু মানবতাবাদ বলতে একটা ধর্মের কথা বেশ শোনা যায়, যার অনুসারীগণ স্রষ্টার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শুধু ন্যায়পরায়নতা, ন্যায় বিচার, সহমর্মিতা, লোকহিত, দয়াশীলতা, ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণ ও কর্ম-ভিত্তিক ইহকাল যাপন করাটাকে প্রাধান্য দেন। সনাতন ধর্মের কিছু জ্ঞানী মানুষ অদ্বৈতবাদী চিন্তা ”অহম্ ব্রহ্মাস্মি” (আমিই পরম সত্য/পরমেশ্বর)-তে বিশ্বাসী, যাদের মধ্যে আছেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাজা রাম মোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ। লালন কিংবা এবং ইরাণের সুফি সাধক হুসাইন ইবনে মানসুর আল-হাল্লাজ , যিনি বলতেন ”আনা আল হাক ‘আমি পরম সত্য” তাঁরা এই দলে পড়েন। গৌতম বুদ্ধ, স্পিনোজা, বা আইনষ্টাইনের ধর্ম ধারণাও অনেকটা তাঁদেরই মত বলেই মনে হয়। তাঁরা সকল জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বা প্রকাশ বলে মনে করেন, এবং তাঁদের জীবন যাপন পদ্ধতি মানবতাবাদী।

প্রতিটি মানব শিশু উক্ত ধর্মগুলোর একটির পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং অনুসঙ্গিক কাহিনী বা মিথের সুদৃঢ়ভাবে পাটাতনের ওপর দন্ডায়মান সংস্কৃতির পরিম‍লে জন্ম গ্রহণ করে। জন্মের পর সে সেটাকে অসচেতনভাবে বিনা প্রশ্নে চর্চা করে বেড়ে ওঠে–সেই সংস্কৃতিতে যুগপৎ পুরুষের বহু-বিবাহ করা, বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকা বিবাহ, সতীদাহ, জাত-পাত প্রথা , নারীকে সন্তান উৎপাদক প্রাণী এবং দাসী বিশেষ জ্ঞান করা, নারী-পুরুষ অর্থাৎ মা-বাবার সমতায় অবিশ্বাস, চারুকলা, সঙ্গীত ও সব রকমের শিল্প চর্চা, এবং গণতন্ত্র অনৈতিক কাজ, ভিন্ন ধর্মের মানুষকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত এবং তা’তে আপত্তি করলে হত্যা করা, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্পদ ও নারী ভোগ্য বস্তু ইত্যাদি স্বাভাবিক বলে শিক্ষা লাভ করে এবং নিয়মিত চর্চা করে সে ওঠে। যেহেতু তার পিতা মাতা, ধর্মগুরু, তথা সমাজ তাকে শেখাচ্ছে যে, ধর্মের সবই ঈশ্বরের মুখ নিসৃত: বানী, সেহেতু প্রশ্নাতীত– এ’ ব্যাপারে যুক্তি তর্ক করাও মহা পাপ– মানুষ তাই মেনে নেয় তার বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিবাদী মনটাকে প্রশ্রয় দেয় না। **-বাকী অংশ ২৮ পাতায়**

দুর্গাপূজা: কেউ মুর্তি ভাঙ্গে, কেউ চুপ থাকে!

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশে মুর্ক্তিভাঙ্গা জানান দিচ্ছে দুর্গাপূজা এসে গেছে। শুধু দুর্গাপূজা নয়, যেকোন পূজার আগে বাংলাদেশে মুমিন মুসলমানের একাংশ তাঁদের ঈমানী দায়িত্বে হিসাবে মুর্তি ভাঙ্গে। প্রায়শ: ওয়াজ মাহফিলে মুর্ক্তিভাঙ্গার পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেয়া হয়। মাওলানা রাজ্জাক তো জোরের সাথেই বলেন: ‘আমি মুসলিম, আমার জন্ম হয়েছে মুর্ক্তি ভাঙ্গার জন্যে’।

ভঙ্গেছেন এমত সংবাদ অবশ্য কখনো চোখে পড়েনি। অন্য মুসলমানরা মুর্ক্তিভাঙ্গা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনা। সরকার উদার, অপরাধীর বিচার করেনা। পুলিশ প্রায়শ: যাঁরা মুর্ক্তিভাঙ্গে তাদের ‘পাগল’ বলে ছেড়ে দেয়। একই পাগল দুইবার ভেঙ্গেছে এমন ঘটনাও আছে। এসব পাগল কিন্তু ‘জাতে মাতাল তালে ঠিক’-এঁরা মন্দির-প্যাগোডা-চার্চ ভাঙ্গে, মসজিদ ভাঙ্গে না?

জামালপুর সরিষাবাড়ীতে প্রতিমা ভাঙ্গচুর হয়েছে, সিসি ক্যামেরায় অপরাধীর ছবি দেখা গেছে, ১জন গ্রেফতার হয়েছে। এ অপরাধে মাঝেমধ্যে গ্রেফতার হয় বটে, চার্জশীট হয়না। কারণ হয়তো পুলিশ মুর্ক্তিভাঙ্গা ‘জায়েজ’ মনে করেন? গাজীপুর কাশিমপুরে কয়েকটি প্রতিমা ভাঙ্গচুর হয়েছে। পুলিশ বলছে বাতাসে মুর্ক্তি ভেঙ্গে থাকতে পারে। এটি নুতন থিওরী। মিডিয়া জানিয়েছে, ঘটনার দিন কাশিমপুরে আবহাওয়া চমৎকার ছিলো, বাতাস ছিলোনা। অপরাধী আগে ছিলো ‘পাগল’, এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে, ‘বাতাস’। নেত্রকোনায় দুর্গাপূজা মন্ডপে দুই প্রতিমা ভাংচুর হয়েছে, আতঙ্কে স্থানীয়রা। কুষ্টিয়ায় মন্দিরে প্রতিমা ভাঙ্গচুর, দুর্বৃত্তরা ক্যামেরা নিয়ে গেছে। মানিকগঞ্জে শতবর্ষী কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙ্গচুর, শৈলকুপায় দুর্গাপ্রতিমা ভাঙ্গা হয়েছে। সাতক্ষীরায় কলাপোতা গ্রামে পূজা মন্ডপে প্রতিমা ভাঙ্গচুর ও প্রতিমার শাড়ী ছিঁড়ে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। ইত্যাকার ঘটনা বাংলাদেশে নুতন নয়, ৫৪ বছরের ধারাবাহিকতা। সম্প্রীতিযাত্রা ৯জেলাকে দুর্গাপূজার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে।

সদ্য হুজুররা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গানের শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছেন। যারা গান ভালবাসে না, তাঁরা মুর্ক্তি ভাঙ্গবে না তো কি? ভাঙ্গাই তো এদের একমাত্র কাজ? এঁরা কখনো কিছু গড়েনি, শুধু ভেঙ্গেছে? পূজার আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নসিহত দিয়েছেন যে মদ খাওয়া চলবে না, পূজার আশেপাশে মেলা বসানো যাবেনা। গ্রামে-গঞ্জে পূজাকে কেন্দ্র করে আশেপাশে ছোটখাট মেলা বসে থাকে, এবার তা বন্ধ। মেলা বন্ধের কারণ হচ্ছে, হুজুররা মেলাতে হিন্দুয়ানী খুঁজে পায়, একই কারণে গ্রামীণ সংস্কৃতি ‘যাত্রা’ বন্ধ হয়ে গেছে। ১৫ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক অনুরোধ করেছেন পূজায় উচ্চ শব্দে গান-বাজনা না বাজাতে, কারণ সব এলাকায় বৃদ্ধ মানুষ থাকে! ভাবটা এমন যে, দিনেরাতে আযান দিলে কোন বৃদ্ধের অসুবিধা হয়না? সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দুই দিনে শারদীয় সাংস্কৃতিক উৎসব করেছে। বাংলাদেশে নাকি এবারো পূজা বেড়েছে, সরকার এটিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হিসাবে প্রচার চালায়। ‘সম্প্রীতি’ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। পূজা হয় সশস্ত্র প্রহরায়, নিরাপত্তা বাহিনী উঠিয়ে দিলে ‘বোঝা যেতো ‘সম্প্রীতি’ কত প্রকার ও কি কি!

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভু’র মুক্তির দাবীতে এবার ঘট পূজা করার বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়, হিন্দুরা সাহস পায়নি কারণ সরকার বারোটা বাজিয়ে দেবে, মব হামলার আশংকা ছিলো। ড.ইউনুস জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক এসেছেন। আসার আগে তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যান, এবং বলেন, দেবী দুর্গার সম্মিলিত শক্তি বাংলাদেশকে সকল দুর্গতি থেকে রক্ষা করুক। সুন্দর বক্তব্য। তিনি হিন্দুদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি।আপাতত: তিনি ভারতের প্রতি কিছুটা প্রসন্ন। দুর্গাপূজায় তিনি শুভেচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু খাগড়াছড়িতে পাহাড়ীদের পিটিয়ে চামড়া তুলে নিচ্ছেন। সেখানে সেনাবাহিনীর গুলীতে আহত হয়ে বাপের কোলে চিৎকার করে চতে চাওয়া কিশোরী উহ্যামে মারমা মারা গেছে। এ ভিডিওটি হৃদয় বিদারক। পিরোজপুরে প্রধান শিক্ষক বিপুল মিত্রের ওপর হামলা চালিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে জঙ্গীরা।

২০২১-এ কুমিল্লার ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে বলেছিলেন, ভারতে কিছু ঘটলে এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে, তিনি বলেছেন, আপনারা মোদিকে বলেন যাতে ভারতে সাম্প্রদায়িক ঘটনা না ঘটে। কুমিল্লার ঘটনার পর হাইকোর্ট ‘জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি’-র নির্দেশ দেন, এটর্নি জেনারেল সেই নির্দেশ বাতিলের জন্যে আবেদন করে তা ‘স্থগিত’ করে দেন, যা ওঠানো সম্ভব হয়নি। রংপুরের ঘটনার পর ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, সরকারের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর জন্যে এসব করা হচ্ছে। এ বক্তব্য অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে পাশ কাটানো। অথচ ঐ সরকারটি নাকি ছিলো প্রগতিশীল। বাংলাদেশে কোন সরকারই কখনো হিন্দুর পক্ষে কোন পদক্ষেপ নেয়নি, বর্তমান সরকার তো বৈরী। বাংলাদেশে সকল সরকারের আমলে মুর্ক্তি ভেঙ্গেছে, এখনো ভাঙ্গছে, এর শেষ কোথায় কেউ জানেনা। মুর্ক্তিভাঙ্গা বা হিন্দু’র ওপর নির্যাতন কিছুটা হলেও কমতো যদি রাজনৈতিক নেতারা এসব নিয়ে কথা বলতেন। তাঁরা মুসলিম, মুর্ক্তিভাঙ্গার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না? বাংলাদেশে কেউ কি কখনো শুনেছে, কোন মুসলমান প্রকাশ্যে মুর্ক্তিভাঙ্গার বিপক্ষে কথা বলেছেন? কেউ ভাঙ্গে, কেউ চুপ থাকে, এটাই চলছে। অনেকে বিশ্বাস করেনা যে হিন্দুরা নির্যাতীত। অনেকে বলতে পছন্দ করেন, হিন্দুরা জামাই-আদরে আছে। তাদের বলি, ঠিক আছে, তাহলে ভারত-সহ পুরো বিশ্বে মুসলমানরা বাংলাদেশের হিন্দুর মত জামাই-আদরে থাকুক, এতে কিন্তু তাঁরা রাজি নন।শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক ॥

পুরনো দিনের পুজোর স্মৃতি

সুশান্ত কুমার দে

আশি দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমার বয়স তখন নয় কি দশ বছর হবে। আমি গ্রামে থাকতাম,আমাদের গ্রামের নাম কুমিরা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষ নদ আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়েই বয়ে গিয়েছে। আমাদের গ্রামের অনতিদূরে উথলী গ্রাম। সেই গ্রামের একজন বিজ্ঞ মনিষী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পৈত্রিক ভিটা বাড়ি। আশ্বিনের দুর্গাপূজার পিতৃপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে আকাশ বাণী থেকে সম্প্রচারিত মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের স্রষ্টা তিনি। উথলী গ্রামের গা ঘেঁষে কপোতাক্ষ নদের দুধারে কাশফুলের সমারোহ, আমনের ধানক্ষেত বাতাসে দোলা দেয়।

আম, জাম, নারকেল, কাঁঠাল গাছের সন্নিবেশিত উথলি গ্রাম। দোয়েল , শালিক, ঘুঘু, ময়না টিয়ে আরও পরিযায়ী পাখিরা এসে একসাথে গান গায়। ভদ্র বংশের মাত্র দুই তিন টি পরিবার এখনো বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের স্মৃতি বিজড়িত পারিবারিক দুর্গা মন্দিরের পূজা অর্চনা অব্যাহত রেখেছেন। পার্শ্ববর্তী নাংলা, সুজন সাহা, গোপালপুর, কুমিরা গ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এসে ইতিহাস খ্যাত অতি প্রাচীন মন্দিরে পূজা পার্বণের সহায়তা করেন। আশির দশকে আমরা খুদে বন্ধুরা একত্রে পায়ে হেঁটে পুজো দেখতে যেতাম।

ষষ্ঠীর দিন থেকে সেজেগুজে বের হয়ে আট দশ খানা ঠাকুর দেখে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতাম। প্রতিটি মন্দিরে তখন কলের গান বাজানো হতো। পান্না লাল ভট্টাচার্যের অসাধারণ শ্যামা সংগীত সর্বত্র শোনা যেত। এখনকার মতো রাতের বেলায় মন্দিরে কোন বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি দেখা যেত না। প্রতিটি মন্দিরে দুই থেকে চারটি হ্যাজাকের আলো জ্বলতো।

প্রত্যেক পূজা মন্ডপের সামনে খাবারের দোকান বসত। দশ পয়সার চিট কিংবা চার আনা দিয়ে এক ছটাক বাদাম কিনে চার বন্ধু আনন্দ করে খেতাম।

একটু তৃষ্ণা মেটাতে পাঁচ পয়সা কিংবা দশ পয়সার আইসক্রিম কিনে খেতাম।

www.jonmobhumi.com

জন্মভূমি Vol 26 No.35 Thursday 16 October 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

শৈশবে আমার দুর্গোৎসব

সুধীর বরণ মাঝি

শৈশব–যেন স্বপ্নের এক রঙিন জগৎ, নির্ভেজাল আনন্দ, কৌতূহল আর খেলাধুলার প্রতিটি মুহূর্ত আবেগ ভরা ভাণ্ডার। জীবনের প্রতিটি স্মৃতি যেন রঙিন ছবির মতো ভেসে ওঠে মনে। সেই স্মৃতির ভেতর একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে দুর্গোৎসব। আমার শৈশবের দুর্গোৎসব কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না; এটি ছিল আনন্দ, উৎসব আর মানবিক মিলনের এক অনন্য স্মৃতিচিত্র। যেখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে আমরা মিলিত হতাম একসাথে। সম্প্রীতির এক অনন্য বন্ধন ছিল। পূজা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই মনে অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করত। দুর্গা পূজার প্রায় দুই মাস আগে থেকেই পয়সা জমাতাম মাটির ব্যাংক কিংবা ঘরের বাশেঁর খুঁটিতে ছিদ্র করে। প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হতো গ্রামের মণ্ডপে। ছোট্ট আমি প্রতিদিন সেখানে যেতাম, দেখতাম কাদা থেকে দেবী দুর্গার ধীরে ধীরে রূপ নেওয়ার বিস্ময়কর দৃশ্য। প্রথমে বাঁশের কাঠামো, তারপর খড়ে ভরাট, কাদার প্রলেপ, আর শেষে রঙের আঁচড়ে যেন প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠত। ছোট্ট চোখে মনে হতো–মা দুর্গা সত্যিই স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন আমাদের মাঝে। কিন্তু এখন দুর্গোৎসব মানে এক ধরনের ভয় আতঙ্ক বিরাজ করে। প্রতিমা বা বিগ্রহ ভাঙ্গার বা মিথ্যে অভিযোগে হামলার শিকার হওয়ার। যা কোন ভাবেই সভ্য মানুষের কাম্য নয়।

দুর্গোৎসব মানেই নতুন জামাকাপড়। আমরা ছিলাম চার ভাই , চর বোন এবং সবার ছোট ছিলাম আমি। তাই আমার বায়নাটা একটু বেশিই ছিল। দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমার বড় ভাই সবাইকে নতুন জামাকাপড় কিনে দিতেন সাধ ও সাধ্যের সবটুকু দিয়ে। বড় ভাই সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাই দুর্গোৎসরে কেনাকাটা ঢাকায় করা হতো। এখনো বড় ভাই দুর্গোৎসবে পরিবারের সবাইকে নতুন জামাকাপড় কিনে দেন। পূজার সময় বাড়িতে যে আনন্দ থাকত, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। নতুন জামাকাপড় পাওয়া ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আবার বাবার সাথে দোকানে গিয়ে জামা বেছে নেওয়া, নতুন চটি বা জুতো কেনা–এসব মুহূর্ত মনে হলে এখনও চোখ ভরে

ওঠে আনন্দে। দুর্গোৎসবে বাবার কাছে অনেক আবদার করতাম।

বাবা আবদার পূরণে উজার করে দিতেন নিজেকে। আজ বাবা নেই, আমি নিজে আজ বাবা হয়েছি । আমার সন্তানরা যখন আমার কাছে আবদার করে তখন বাবাকে খুব মনে পড়ে। দোকানে নতুন পোশাক বাছাইয়ের মুহূর্তটি ছিল অদ্ভুত আনন্দে ভরা। জামা হাতে পেলে আর দমে রাখা যেত না, বারবার দেখতাম। বন্ধুদের বলতাম। পূজার সকালে সেই জামা পরে যখন বন্ধুদের সঙ্গে বের হতাম, মনে হতো আমি যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী শিশু।

শৈশবে আমার দুর্গোৎসব তা কেবল উৎসব নয়–এটি ছিল আনন্দের রঙে আঁকা শৈশবের ক্যানভাস, পারিবারিক ভালোবাসার উষ্ণতা আর সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। যখনই মনে পড়ে, হৃদয় ভরে ওঠে নস্টালজিয়ায়। হয়তো সেই দিন আর ফিরে আসবে না, কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে শৈশবের পূজা আজীবন থাকবে উজ্জ্বল, আবেগঘন এক অধ্যায় হয়ে। আমার শৈশবের দুর্গোৎসবের সবচেয়ে প্রিয় অংশ ছিল ঢাকের বাজনা। ঢাকের গর্জন উঠলেই মন নেচে উঠত। ভিড়ের মাঝেও দাঁড়িয়ে থাকতাম চুপচাপ, শুধু ঢাকিদের নাচের ভঙ্গি আর তাল-লয়ের ঝড়ে মুগ্ধ হয়ে। কখনো আবার বন্ধুদের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে গিয়ে অজান্তেই পা কাঁপত, শরীর নাচত। সন্ধ্যায় আড়তি হতো । ঢাকের তালে নাচতাম বন্ধুরা মিলে সবাই। ছোট ছিলাম বলে অনেক সময় বড়রা আড়তির সময় মন্ডপের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখত।মন্ডপের প্রসাদ খাওয়াও ছিল এক অমূল্য আনন্দ। নাড়ু, খই, বুরিন্দা, কাঁচা প্রসাদ, মিষ্টির স্বাদ যেন ভিন্নতর হয়ে উঠত পূজার আবহে। কলা পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম ধৈর্য ধরে, কিন্তু মনে হতো সময় আর কাটছে না। প্রসাদ মুখে পুরলেই মন ভরে যেত। আমার শৈশবের পূজা শুধু আনন্দেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল সামাজিক বন্ধনেরও এক মহান উৎসব। আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে পূজার কাজে হাত লাগাত। মণ্ডপ সাজাতে, আলো ঝুলাতে কিংবা প্রসাদ বিতরণে ধর্ম-বর্ণের বিভাজন কোথাও ছিল না। এখন বুঝি–এই সম্প্রীতির শিক্ষা-ই ছিল পূজার আসল প্রাপ্তি। তবু পূজার সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত ছিল প্রতিমা বিসর্জনের দিন। দেবীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছোট্ট হৃদয়ে যেন হাহাকার বয়ে যেত। নদীর জলে প্রতিমা ভেসে যাওয়ার সময় আমরা দাঁড়িয়ে কাঁদতাম। মনে হতো–মা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দূরে। কিন্তু সেই দুঃখের মাঝেই জন্ম নিত নতুন আশার আলো–"আবার আসিবে মা, আবার হবে উৎসব।"

শৈশবে দুর্গোৎসব মানেই ছিল উৎসবের আমেজ, রঙিন আলো আর অদ্ভুত এক আনন্দ। আমাদের এলাকায় দুর্গাপূজাই সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল। দুর্গা মণ্ডপ সাজানো , ঢাকের বাদ্য, আর আলোকসজ্জা–সবকিছু যেন নতুন করে প্রাণ দিত আমাদের। পূজা শুরু হবার অনেক আগেই আমাদের মনে উচ্ছ্বাসের ঢেউ বয়ে যেত। বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপে যাওয়া, প্রতিদিন প্রতিমার গড়নের পরিবর্তন দেখতে দাঁড়িয়ে থাকা ছিল আমার অন্যতম আনন্দের জায়গা। কাদা থেকে প্রতিমার কাঠামো তৈরি, তারপর ধীরে ধীরে রঙের আঁচড়ে প্রতিমার জীবন্ত হয়ে ওঠা–এসব আমার কাছে ছিল যেন জাদুর মতো। আজ সময়ের স্রোতে ভেসে শৈশব বহু দূরে হারিয়ে গেছে। এখনো পূজা হয়, মণ্ডপে ভিড় জমে, আলো ঝলমলে সাজসজ্জা হয়, কিন্তু সেই সরল আনন্দের গভীরতা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের পূজায় রয়েছে আধুনিকতার ঝলক, কিন্তু শৈশবের পূজার নির্মল আবেগ আর রঙিন স্মৃতি হৃদয়ের গভীরে অমর হয়ে আছে। শৈশবে আমার পূজা তাই কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি ছিল শৈশবের নির্মল আনন্দ, পারিবারিক ভালোবাসা ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। জীবনের পথে যতই এগোই না কেন, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই মন ভরে ওঠে নস্টালজিয়ায়। হয়তো সেই দিন আর ফিরে আসবে না, কিন্তু স্মৃতিগুলো আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়– শৈশবের দুর্গোৎসব তাই আমার জীবনের গোপন রঙতুলি, যা স্মৃতির ক্যানভাসে আজও আঁকে আনন্দের উজ্জ্বল ছবি। শৈশবের দুর্গোৎসবের মতো দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসতো তবে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিরাপদ ও সুখী জীবন উপভোগ করতে পারতাম।

শৈশব–যেন স্বপ্নের রঙিন জগৎ; নির্ভেজাল আনন্দ, কৌতূহল আর খেলাধুলায় ভরা ভান্ডার। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল আবেগঘন, আর সেই স্মৃতির ভেতর এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে দুর্গোৎসব। আমার শৈশবের দুর্গোৎসব কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না; এটি ছিল আনন্দ, উৎসব আর মানবিক মিলনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা, যেখানে ধর্ম-বর্ণ ভুলে সবাই মিলিত হতো সম্প্রীতির বন্ধনে।

পূজা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই উত্তেজনা কাজ করত। দুর্গাপূজার দুই মাস আগে আমরা মাটির ব্যাংক কিংবা বাঁশের খুঁটির গোপন ছিদ্রে পয়সা জমাতাম। মন্ডপে প্রতিমা গড়ার কাজ ছিল আমাদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। বাঁশের কাঠামো, খড়ের ভরাট, কাদার প্রলেপ আর শেষে রঙের আঁচড়ে দেবী দুর্গা ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠতেন। শিশুমনে সত্যিই মনে হতো–মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন আমাদের মাঝে।

দুর্গোৎসব মানেই নতুন জামাকাপড়। আমরা ছিলাম চার ভাই ও চার বোন; সবার ছোট ছিলাম আমি, তাই আমার বায়নাটাও বেশি ছিল। বড় ভাই, যিনি সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সাধ্যের সবটুকু দিয়ে সবাইকে নতুন পোশাক কিনে দিতেন। সেই দোকান বাছাই, জামা হাতে নিয়ে বারবার দেখা, বন্ধুদের দেখানো–এসব মুহূর্ত আজও মনে হলে আনন্দে চোখ ভরে ওঠে।

বাবার কাছে আবদার করতাম, তিনি উজাড় করে দিতেন স্নেহ। আজ বাবা নেই, কিন্তু আমার সন্তানদের আবদারে বাবার কথাই বারবার মনে পড়ে।

শৈশবের পূজার সবচেয়ে প্রিয় অংশ ছিল ঢাকের বাজনা। ঢাকের গর্জনে মনে হতো, পুরো গ্রাম যেন আনন্দে নেচে উঠছে। ঢাকিদের ছন্দময় নাচ, আড়তির ঝংকারে মন্ডপ মুখর হয়ে উঠত, আর আমরা শিশুদের শরীরও অজান্তেই দুলত সেই তালে।

আরেকটি অবিস্মরণীয় আনন্দ ছিল প্রসাদ খাওয়া। নাড়ু, খই, বুরিন্দা কিংবা মিষ্টি–সবই পূজার আবহে হয়ে উঠত অন্যরকম স্বাদময়। কলাপাতা হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সেই ধৈর্য ও প্রসাদ মুখে পুরলেই মনে ভরে ওঠা তৃপ্তি আজও ভোলার নয়।

আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই পূজার কাজে অংশ নিত। মন্ডপ সাজানো, আলো ঝোলানো কিংবা প্রসাদ বিতরণে কোনো বিভাজন ছিল না। এখন বুঝি– শৈশবের পূজা আমাদের শিখিয়েছে মানবিক সম্প্রীতির অমূল্য শিক্ষা।

সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত ছিল প্রতিমা বিসর্জনের দিন। দেবীর বিদায়ের সঙ্গে আমাদের ছোট্ট হৃদয়ে নেমে আসত হাহাকার। নদীর জলে প্রতিমা ভেসে যাওয়ার সময় চোখ ভিজে উঠত, মনে হতো–মা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দূরে। কিন্তু সেই দুঃখের ভেতরই জন্ম নিত আশার আলো–"আবার আসিবে মা, আবার হবে উৎসব।"

আজও পূজা হয়, মন্ডপ ভরে ওঠে আলো-ঝলমলে সাজে, ভিড় জমে, তবু সেই শৈশবের সরল আনন্দ খুঁজে পাই না। আধুনিকতার ঔজ্জ্বল্য আছে, কিন্তু নেই সেই নির্মল আবেগ। তাই আমার কাছে শৈশবের দুর্গোৎসব শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়–এটি ভালোবাসা, পারিবারিক উষ্ণতা আর সামাজিক সম্প্রীতির রঙে আঁকা এক অমর স্মৃতি। সময় যতই এগিয়ে যাক না কেন, সেই দিনগুলো আমার হৃদয়ে রয়ে গেছে নস্টালজিয়ার দীপশিখা হয়ে, যা বারবার মনে করিয়ে দেয়–শৈশবের দুর্গোৎসব আমার জীবনের গোপন রঙতুলি, যা স্মৃতির ক্যানভাসে আজও আঁকে আনন্দের উজ্জ্বল ছবি।

সুধীর বরণ মাঝি,শিক্ষক,হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুর।

আজি এ রাঙ্গা প্রাতে প্রণাম লহ দেবী বিপ্লবী বীরকন্যা প্রীতি লতা!

শৈলেন কুমার দাশ

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ বীর বিপ্লবী বঙ্গকন্যা, চট্টলার আদুরে দুলালী! আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর তাঁর মহান প্রয়াণ দিবসে বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণীয়-বরণীয় এক মহান বঙ্গকন্যা; বিপ্লবের রাজকন্যা!

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এক মহান বীরকন্যা, বিপ্লবী ও স্বাধীনতার মহামন্ত্র ধারণকারী এক মহাঅগ্নি স্ফুলিঙ্গসম ভারতবষর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী। অসম্ভব মেধাবী এই বঙ্গ কন্যা ঢাকার ইডেন কলেজে পড়ার সময় তার সহপাঠীরা বলেছেন, যে মেয়েটি ছিল অতি নরম মনের অধিকারী, একটি পিঁপড়াও যে মারতে পারতো না সেই মেয়েই এক সময় হয়ে উঠেন ইংরেজদের জন্য এক মহাবিপ্লবী ত্রাস! তাতেই বুঝা যায় দেশের জন্য ভালোবাসা কতটা অনুরণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল এই মহাবিপ্লবী মাস্টারদা সুর্যসেনের সুযোগ্য শিষ্যাকে! আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর দেশের জন্য তোমার মহান আত্মাহুতি দিবস! আজ এই মহান প্রয়াণ দিবসের মহা শুভক্ষণে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তোমাকে স্মরণ!

হে কন্যা তোমার ও তোমার মহান গুরুদেব বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের মহাপ্রজ্জলিত নেতৃত্বের শক্তি আর বঙ্গপুত্র নেতাজি সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামের মহান নেতৃত্বের হাত ধরেই আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই উপমহাদেশের মহান স্বাধীনতা তথা সুকৌশলী ব্রিটিশ বেনিয়াদের কুচক্রের কবল থেকে ও কঠোর অন্যায়ের নাগপাশ থেকে একশ নব্বই বছরের ঘৃণ্য শৃঙ্খল মুক্তির একমাত্র শৌর্যদীপ্ত বিপ্লবী তুমি সহ বঙ্গমাতার এই তিন আরাধ্য সন্তান! সেইসাথে অগণিত বিপ্লবী সন্তান স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রভাগ পুরোটাই সাজিয়েছিলেন মহান স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত অসীম সাহসী শ্যামলী সবুজ বঙ্গের পুত্রকন্যারা!

এই মহাবিপ্লবী কন্যা প্রীতিলতার জন্ম ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা শ্রী জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রাম পৌরসভার হেড ক্লার্ক। বাবা মায়ের অতি আদরের কন্যা ছিলেন প্রীতিলতা! শিক্ষা অনুরাগী মা বাবা মেধাবী কন্যার লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন খুবই আগ্রহী।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের বিপ্লবী আন্দোলনের মন্ত্রে উজ্জিবিত এক মহাবিপ্লবী কন্যা ও ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামে প্রীতিলতাই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম আত্মোৎসর্গকারী এক মহান বিপ্লবী কন্যা।

প্রীতিলতা চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজে ভর্তি হন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর দুই বছর পর প্রীতিলতা কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিস্টিংশনসহ গ্রাজুয়েশন করেন।

ইডেন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে প্রীতিলতা বিপ্লবী লীলা নাগের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বিরোধী দীপালি সংঘের সাথে যুক্ত হন। শ্রীসংঘেরও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শ্রীসংঘ ছিল ঢাকার একটি বিপ্লবী সংগঠন যার নেতৃত্বে ছিলেন বিপ্লবী অনীল দাস। এই সংগঠনের নারী শাখার নেতৃত্বে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এই সংস্থাটি মূলত ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল এবং এটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লিগ নামেও পরিচিত ছিল।

কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে কল্যাণী দাসের নেতৃত্বাধীন ছাত্রীসংঘের সদস্য হন প্রীতিলতা। সেই প্রতিকুল পরিবেশে একজন মেয়ে হিসাবে একাধিক বিপ্লবী দলের সদস্য হওয়া কতটা কঠিন ছিল তা অনুমান করাও দুষ্কর! এ থেকেই বুঝা যায় দেশের স্বাধীনতার মন্ত্র কতটা দেদীপ্যমান ছিল প্রীতিলতার অন্তরে।

গ্রাজুয়েশন করার পর তিনি চট্টগ্রামের ইংলিশ মিডিয়াম নন্দনকানন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের (বর্তমানে অপর্ণা চরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ) প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। যে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বাহাদুর অপর্ণা চরণ দে। যার একান্ত অনুরোধে প্রীতিলতা স্কুলের এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে সমগ্র বাংলা জুড়ে কুচক্রী ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে অনেক বিপ্লবী দল সংগ্রামরত ছিল। ঐসব দলের সদস্যরা বিশ্বাস করত যে, কেবল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাধীধতা সংগ্রামের গোপন দলিলপত্র প্রদর্শন ও অধ্যায়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ বেনিয়ারা। দেশ মাতৃকার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আর দৃঢ় চিত্তের অধিকারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সেসব নথিপত্র গোপনে পাঠ করে দেশের স্বাধীনতার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হন।

প্রীতিলতার এক ভাই মাস্টারদা সুর্যসেনকে তাঁর বিপ্লবী চেতনা সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাথে মাস্টারদা সূর্য সেনের দেখা হয় ১৯৩২ সালের মে মাসে। যা পরবর্তীকালে প্রীতিলতার বিপ্লবী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্র লুট, রেললাইন উপড়ে ফেলা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বিকল করে দেয়াসহ ব্যাপক আক্রমণ হয়। এ আক্রমণ চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ নামে পরিচিতি পায়। এ আন্দোলন সারাদেশের ছাত্রসমাজকে উদ্দীপ্ত করে। চাঁদপুরে হামলার ঘটনায় বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হয় এবং তিনি আলীপুর জেলে বন্দি হন। প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের বোন পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন। রামকৃষ্ণের প্রেরণায় প্রীতিলতা বিপ্লবী কাজে আরো বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৩১ সালে ৪ আগস্ট রামকৃষ্ণের ফাঁসি হওয়ার পর প্রীতিলতা আরো বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তখন তিনি এই আন্দোলনকে কিভাবে আরও প্রচন্ড শক্তিশালী করা যায় সেজন্য অস্হির হয়ে পড়েন। এবং মাস্টারদা সুর্যসেনের সাক্ষাত লাভের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেন। ওই সময়ের আরেক বিপ্লবীকন্যা কল্পনা দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রীতিলতার। বিপ্লবী কল্পনা দত্তের সহায়তায় ১৯৩২ সালের মে মাসে প্রীতিলতার সাক্ষাত হয় মাস্টারদা সুর্যসেন ও বিপ্লবী নির্মল সেনের সঙ্গে। নির্মল সেনের নিকটে প্রীতিলতা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন।

১৯৩২ সালের ১৩ জুন মাসে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকের সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা তাঁদের ঘিরে ফেললে বিপ্লবীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যা ধলঘাট যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। মাস্টারদা ও প্রীতিলতা পালাতে সক্ষম হন। আর তখন থেকেই পুলিশের জরুরি গ্রেফতারি তালিকায় প্রীতিলতার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাণ দেন নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। পুলিশ সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। মাস্টারদার নির্দেশে জুলাই মাসে প্রীতিলতা স্কুলের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপনে চলে যান।

প্রীতিলতা সাথে সাহসী বিপ্লবী বীরকন্যা কল্পনা দত্ত সহ গোপন আস্তানায় চলে যান।

প্রীতিলতা সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন। তিনি টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন দখল অভিযানে যুক্ত ছিলেন। তিনি জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ' এইরূপ অবমাননামূলক কথার জন্য ক্লাবটির দুর্নাম ছিল। ক্লাব আক্রমণ সফল করে পুরুষবেশী প্রীতিলতা সামরিক কায়দায় তাঁর বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই সময়ে তিনি গুলিবিদ্ধ হলে তাৎক্ষণিকভাবে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আত্মদান বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামকে আরো উজ্জিবিত করে তোলে। যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনকে হাজার গুণ অগ্রগামী করে তোলে।

ভারতবর্ষের শ্যামল প্রান্তর এই বিপ্লবী বঙ্গকন্যার কাছে চিরঋণী! তাই মহান শ্রদ্ধায় আজ তাঁর মহান আত্মাহুতি দিবসে এই বিপ্লবী কন্যাকে স্মরণ। বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় এই বিপ্লবী কন্যার স্মরণে প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত হোক। তবেই এই মাটি হয়তো প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার গানি থেকে মুক্তির ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ করতে সক্ষম হবে।

শৈলেন কুমার দাশ,লেখক, কলামিস্ট, কানাডা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

Ya Devi Sarva Bhuteshu Matri Rupena Sansthitha
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

বিঃ দ্রঃ দিব্যধাম মন্দিরের ২য় তলার দেয়ালের সংস্কারের কারনে আমাদের বিকল্প স্থান হিসাবে, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে এবারের মহালয়া ও শ্রীশ্রী দুর্গা পূজার আয়োজন করতে যাচ্ছি। আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থি। আপনারা সবাই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে (গীতা সংঘের উডসাইড) উপস্থিত থেকে মায়ের আর্শীবাদ গ্রহণ করিবেন

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী

24th ANNIVERSARY

শারদীয় উৎসব ও দুর্গাপুজা

১৬ই অক্টোরর শুক্রবার থেকে ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার ২০২৬ইং পর্যন্ত

আয়োজনেঃ সার্বজনীন পুজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক.

স্থান: ৩৯-১৬, ৬০ স্ট্রীট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার, আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধবে নিমন্ত্রন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।

বিনয়াবনতঃ

সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

শ্রী প্রবীর কুমার রায়	শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল	শ্রী রঞ্জিত দে রায়	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস	শ্রী প্রদীপ দত্ত	শ্রী মানিক দেবনাথ
চেয়ারম্যান	মেম্বার সেক্রেটারি	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক,	আহ্বায়ক	আহ্বায়ক সেক্রেটারী,
৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫	৬৪৬-৪২৭-২৩১৬	(৯১৭) ৪৫৯-৭১১০	(৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯	(৩৪৭) ৫৭৫-৯১০২	(৯৫৪) ৯১৮-৮৬৩৬

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ সার্বজনীন পুজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ

সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রী উৎপল চৌধুরী ও শ্রীমতি ডালিয়া চৌধুরী।

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.supusa.org , FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্বাধিকারী সার্বজনীন পুজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

দেবী দুর্গা ও তার বাহন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

(৫ পাতার পর) ত্রিগুণাতীত সেই ভূমিতে পরম শিবের অবস্থান। সে জন্যই গুণময়ী দেবীর মাথার উপরে গুণাতীত দেবাদিদেব শিবের অধিষ্ঠান। মর্তের মালিন্য যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই উত্তুঙ্গ শিখরে পরম ধাম তুষারধবল কৈলাস অবস্থিত। শুদ্ধ মনের নির্মল মানস সরোবরে তার উদ্ভাসন ধরা পড়ে, কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সাধককে সেখানে উপস্থিত হতে হয়। সেই উত্তরণেই সাধনার সমাপ্তি এবং সাধকের লক্ষ্যপ্রাপ্তি। সেই উত্তরণে যেন গঙ্গা এসে উপনীত হয় সাগর সঙ্গমে। এ মিলনের জন্যই তো গোমুখ থেকে ভাগীরথীর দীর্ঘ তীর্থযাত্রা। সাধকের ক্ষেত্রেও তীর্থগতির যতি নির্মল মানস সরোবরে অবগাহন করে সম্পূর্ণ মালিন্য শুদ্ধ হয়ে সিদ্ধির কৈলাস-শিখরে উত্তরণে। সেই উত্তরণের অপর নাম জীবের শিবত্বলা ভুদেহীর ব্রহ্মময়ত্ব প্রাপ্তি।

বস্তুত, যিনিই মহিষাসুর, তিনিই সিংহ, তিনিই দুর্গা এবং তিনিই আবার শিব। শুধু স্তরভেদ, শুধু আত্মোন্মোচন ও আত্মোপলব্ধির ক্রমিক অবস্থা। মহিষ স্তর জীবের সর্বনিু স্তর বা শক্তির অবিকশিত স্তর। সিংহ স্তর জীবশক্তির ক্রমবিকশিত বা ক্রমবিবর্তিত উচ্চতর অবস্থা। দুর্গা স্তর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত জগতে জীবশক্তির সর্বোচ্চ স্তর। কিন্তু সেটিই সর্বশেষ স্তর নয়। এর পর জীবশক্তির ইন্দ্রিয়াতীত পরম স্তর। সেটি শিব স্তর, যেখানে জীব ও শিবের ব্যবধান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

বিষয়টি এভাবেও ভাবতে পারি : মহিষাসুর স্তর যেন যোগ বা তন্ত্রের প্রথম তিনটি পদ্ম বা চক্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর (লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি)। সিংহ স্তর যেন পরবর্তী দুটি পদ্ম বা চক্র অনাহত ও বিশুদ্ধ (হৃদয় এবং কণ্ঠ) এবং দুর্গাস্তর যেন ষষ্ঠ পদ্ম বা চক্র আজ্ঞা (ললাট/ভ্রুমধ্য)। পরিশেষে শিব স্তর যেন সপ্তম বা সর্বশেষ ভূমি সহস্রার (মস্তক/ব্রহ্মরন্ধ্র)। মহিষাসুরই উত্তরিত হতে হতে ক্রমে সিংহ ও দুর্গা হয়ে অবশেষে শিবত্বে উন্নীত হলেন। পুরাণের মতে মহিষাসুরের জন্ম শিবাংশে। মহিষাসুর আসলে জীবরূপী অবিকশিত শিব। অন্যভাবে বলা যায়, মূলাধারে অধিষ্ঠান কুণ্ডলিনী শক্তির। শক্তি তখন অব্যক্ত। সাধনার দ্বারা তার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণ ক্রমশ গুণগত উৎকর্ষে উত্তরিত হয় বিশুদ্ধে এবং পরিশেষে পরম অভিব্যক্তিপ্রাপ্ত হয় সহস্রারে উত্তরণে। সেখানে অধিষ্ঠান শিবের। সেখানে শক্তি ও শিব মিলিত হন। অর্থাৎ জীব শিব হয়ে যায়। পুরাণে বলা হয়েছে, মহিষাসুরকে বধ করেই দুর্গা 'হরপাদমূলে' প্রবেশ করলেন (দ্র. বামনপুরাণ, ২০। ৫১)। শিব-দুর্গার এ একাত্মতার তাৎপর্য মহিষাসুর কোনো শরীরী জীব নয়, মহিষাসুর মানুষের অন্তর্নিহিত পশুত্বের প্রতীক। পশুত্বের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের দেবত্বের বিকাশ। মাতৃচরণে মহিষাসুরের নিত্য অবস্থানে সাধকের পরম শরণাগতির ইঙ্গিতও আমরা পাই। সন্তানভাব সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাব। জীব যখন সেই ভাবকে আশ্রয় করে তখন সর্বরিপুর আদিরিপু কাম আর মাথা তুলতে পারে না। আদিরিপুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ রিপু লোভ ও মোহ। পশুর মধ্যে মহিষ এই রিপুত্রয়ের প্রতীক। আর সিংহ? সেও মাতৃচরণে শরণাগত। সিংহ পশুরাজ, কিন্তু পশু তো নিশ্চয়ই। রিপুই তো মানুষের পশুত্ব। সিংহ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রিপুর প্রতীকুক্রোধ,মদ ও মাৎসর্য। মাতৃচরণে তাদেরও নিঃশেষে বলি দিতে হবে। মাতৃকরুণায় তখনই হবে জীবের জৈবসত্তার বিলয় ও দৈবসত্তার জাগরণ। সেই জাগরণেই জীবের সার্থকতা, জীবনের চরিতার্থতা।

মার্কণ্ডেয় ও বামন পুরাণের মতে, দেবী যেমন সর্বদেবতেজঃ সম্ভূত, দেবীপুরাণের মতে দেবীর বাহনও তেমনি সর্বদেবময়। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে, দেবীর শত্রুদর্পনাশকারী বাহনকে স্বয়ং বিষ্ণু নির্মাণ করেছিলেন এবং তার মধ্যে সর্বদেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল। অর্থাৎ দেবীর মতো দেবীর বাহনও সর্বদেবময়। এর তাৎপর্য হলো, যে নিজের মধ্যে দেবাত্মশক্তিকে প্রকট করতে সমর্থ, দেবীর চরণাশ্রয় পাওয়ার অধিকারী সে-ই। সুতরাং জৈবশক্তিকে দমন করে তাকে দৈবশক্তিতে উত্তরণ করানোর ব্যঞ্জনাই নিহিত দেবীর সিংহবাহনত্বে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

রাহুল পুরকায়স্থ

(২৮ পাতার পর) রূপান্তরের মালিক শান্তি। শান্তি কলোনির কালী নাচের দলে কালী সাজতেন। আমার প্রায় মধ্যরাতে চোখ কচলাতে কচলাতে দেখতাম, নাচের আগে ও পরে শান্তি, মাকালী পাঁচিলে পা দোলাতে দোলাতে বিড়ি টানছেন! তার এক হাতে বিড়ি, আর এক হাতে টকটকে লাল জিহ্বা! সেই থিমশিল্পীর নাম দীপক ভট্টাচার্য। তিনি আমার জীবনের প্রথম জাদুকর। যেন ম্যাজিক। পুজোর ক'দিনের জন্য পূর্বাশার প্যান্ডেল হয়ে উঠত জাদুবাস্তবের রণাঙ্গন। দীপক ভট্টাচার্য আমার লতাপাতার আত্মীয়। তারসঙ্গে কিছুদিন পর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখব, চিনব পুজোর শহর। পুজোর কলকাতা। তিনি জানাবেন যে, কালীমূর্তি রচনাই সবচেয়ে পরিশ্রমের। কালী নগ্নিকা। কালী সুন্দরীতমা। বলবেন, কালীর দেহ নগ্ন, তাই সম্পূর্ণ পলিশ করতে হয়।

পুজোর প্রায় দিন পনেরো আগে থেকেই পূর্বাশার মণ্ডপ হয়ে উঠত আমার জাদুশিক্ষার কারখানা। কাপড়ের পটে আর পেজা তুলোয় তৈরি হতো আকাশ, ওড়ানো হতো পাখি, তৈরি হতো পাহাড়, চটের পাহাড়, তার ওপর সবুজ উপত্যকা। উপত্যকায় দুর্গা আসবেন। তৈরি হচ্ছে আবহ।

ততদিনে কুমোরটুলিতে খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ। রং করা হতো প্রতিমার মুখে, গলায়, হাতে। ছাঁচের চোখে তুলি বোলানো হতো। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর এবড়োখেবড়ো প্রায় সর্বাঙ্গ। আর অসুর, গণেশ ও কার্তিকের নিম্নাঙ্গ ঢেকে যেত বস্ত্রে। শুধু চোখের মণি, সেই গোলাকার মরকত আঁকা হতো না তখনও। মহালয়ার ভোরে চক্ষুদান। তারপর প্রতিমা মণ্ডপে মণ্ডপে।

পূর্বাশার মণ্ডপেও এসে গেছে প্রতিমা। খানিক অন্যরকম। ঈষৎ বাঁকা, উড়ন্ত। একটি বাঁশ প্রতিমার পিঠসর্বস্ব পশ্চাৎদেশে গেঁথে দেওয়া। এই বংশদণ্ডটিই দুর্গার একমাত্র অবলম্বন। পা শূন্যে, বাঁশ মাটিতে। বাঁশটি পাহাড়ে ঢাকা। একইরূপে উড়ন্ত কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী ও সিংহ, ময়ূর, পেঁচা, হাঁস, এমনকি ইঁদুরটিও। কেবল লক্ষ্মী উড়তেন না, তিনি অচঞ্চলা। যাবতীয় উড়ানের সাক্ষী। আর অসুর, মরিয়া অসুর, তীরবিদ্ধ অর্ধেক অসুর, অর্ধেক মহিষ? তার দিকে ধেয়ে আসছে আরও তীর, ত্রিশূল, চক্র, বল। দীপক ভট্টাচার্য বললেন, এই ধর কালো সুতো, ত্রিশূলের লেজে আর মুড়ায় ভালো করে বাঁধ, বাঁধলাম। দীপক ভট্টাচার্য ত্রিশূলটিকে মণ্ডপের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। বললেন, বাইরে গিয়ে দূর থেকে দ্যাখ, কমসে কম আট ফুট দূর। দূরে গেলাম। তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন, সুতোটা দেখা যাচ্ছে কিনা, মাথা নাড়লাম, না। তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন, মাথা নিচু করে গুপ্ত মন্ত্রের মতো বললেন, শোন্?, মনে রাখবি, আর্টে দূরত্বই একমাত্র সত্য। আমি দূরত্ব জানলাম, সত্য জানলাম।

তারপর পুজো আসে। পুজো চলেও যায়। যে বছর মোহিনী মিল বন্ধ থাকে, সে বছর পুজো ম্লান। যে বছর খোলা থাকে, সে বছর রামধনু। চার দিন, পাঁচ দিন, অতঃপর ঢাকের বোলে বিসর্জন। মণ্ডপ খা খা। শূন্য মণ্ডপে প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের আলো আমাদের আকাক্ষা। আসছে বছর আবার হবে। আবার দেখা হবে যতীন দাসের দুর্গা।

লেখক :পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি

সুমন পালিত

ছিল প্রতিদিন নতুন পাঞ্জাবি আচকান ও জরির টুপি। আর মেয়েদের জন্য ছিল প্রতিদিন নতুন শাড়ি। দেবী দুর্গার মাথায় শোভা পেত সোনার মুকুট। গতর ভরা সোনার অলংকার। সে অলংকার আনা হতো ফ্রান্স থেকে। সাজসজ্জার পিছনে যে ব্যয় হতো তা ছিল অকল্পনীয়। দুর্গাপূজায় ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হতো ৫১ রকমের। সোনার থালা ও বাটিতে দেওয়া হতো সেই ভোগ। তবে এ উপলক্ষে পশু বলি দেওয়া হতো না। কারণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা ছিল বৈষ্ণব। পশুর বদলে দেওয়া হতো কুমড়ো বলি। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্রী বিনয়িনী দেবী লিখেছেন, রুপোর প্রদীপ দানিতে এক হাজার একটি ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে, রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শুরু হতো। প্রতিমার দুই পাশে জ্বলত ঘিয়ের প্রদীপ। তিন দিন তিন রাত ধরে প্রদীপ জ্বলত।

ঠাকুররা ছিল অভিজাত পরিবার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে দুর্গাপূজার সময় তারা হতেন উদার। এ সময়ে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। কলকাতার বিশিষ্টজনদেরও পূজা উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হতো। আমন্ত্রণ পেত ইংরেজরাও। দেবী বিসর্জনের দশমীর দিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল বের হতো। দেবী সঙ্গে নিয়ে বের হতেন ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা। তার আগে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়া হতো ঠাকুরবাড়ি থেকে। তারা বিশ্বাস করতেন এই পাখি কৈলাসে গিয়ে মহাদেবকে পার্বতীর আগমন বার্তা জানিয়ে দেবে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুর্গার গায়ে যে গহনা থাকত সেগুলোসহ বিসর্জন দেওয়া হতো। কেউ যাতে বিসর্জনের আগে তা খুলে না নেয় সে ব্যাপারে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কড়া নির্দেশ ছিল। ঠাকুরবাড়ির প্রতিমার গয়নাগাটি নেওয়ার জন্য গঙ্গাতীরে অসংখ্য লোকের ভিড় হতো। শুরু হতো প্রতিমার গহনা লুটের প্রতিযোগিতা। দেবী বিসর্জনের পর ঠাকুরবাড়িতে চলত আরেক উৎসব। নাচ ও গান বাজনার জলসা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা হতো বাইজিদের। যাত্রার আয়োজন করা হতো ঘটা করে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যে অপচয়-অপব্যয়ের উৎসব চলত, তাতে ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সন্তানরা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ও তার ভাইয়েরা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। যে ধর্ম ছিল মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করেন এই ধর্মের অনুসারীরা।

প্রিন্স দ্বারকানাথের রাজকীয় জীবনযাপনের খরচ মেটাতে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘাড়ে পরিবারের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর ধারদেনা শোধ করতে তিনি কৃচ্ছ্রতার আশ্রয় নেন। কঠোর পরিশ্রম করেন তিনি। নতুবা ঠাকুর পরিবারের অগ্রযাত্রা হয়তো তার আমলেই থেমে যেত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা ছিল সারা বাংলার প্রধান আকর্ষণ। ১৮৬১ সালে সে পূজা বন্ধ হওয়ার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব হারায় এ পরিবারটি। তবে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নোবেল জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তা শুধু কলকাতা নয়, জগৎজুড়ে পরিচিত হয়ে ওঠে।

দুর্গাপূজা এক সময় ছিল ধনী বণিকের পূজা। তবে পরবর্তীতে তা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্বজনীন পূজায় পরিণত হয়। সমষ্টিগতভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয় বাংলাজুড়ে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আজকের বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের পূর্ব অংশ। পশ্চিম অংশ ছিল হাজার মাইল দূরে আরেক প্রান্তে। যেটি এখন পাকিস্তান নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তানে দুর্গাপূজা পালিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল দেখার মতো। আজকের লেখাটি শেষ করব শিরোনামে উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১১ বছরের মাথায় জারি হয় সামরিক শাসন। মীরজাফরের বংশধর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের যোগসাজশে তিনি সামরিক আইন জারি করেন। মাত্র ২০ দিন পরে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে নিজেই ক্ষমতা হাতে নেন আইয়ুব খান। নিজেকে ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসক। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন লে. জেনারেল আজম খান। আজম খানকে বলা হতো বেলুচিস্তানের কসাই। স্বাধীনতাকামী বালুচদের দমনে তিনি নৃশংসতার পথ বেছে নেন। লাহোরের কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা দমনে নিজের হাত লাল করেন তিনি। এহেন আজম খান পূর্ব বাংলায় আবির্ভূত হন এক ভিন্ন মানুষ হিসেবে। ঢাকার আজমপুর এবং খুলনার আজম খান কমার্স কলেজ এখনো এই পাকিস্তানি জেনারেলের নাম ধারণ করে আছে।

যা হোক জেনারেল আজম খান সম্পর্কে একটি গল্প বেশ প্রচলিত ছিল পাকিস্তান আমলে। গল্পটি মরহুম সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর কাছ থেকে শোনা। তিনি এটি শুনেছিলেন যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলামের কাছ থেকে। গল্পটি এরকম। গভর্নর গিয়েছেন দুর্গাপূজা মন্ডপ পরিদর্শনে। এ সময় পুরোহিতরা গভর্নরের কাছে হিন্দু ধর্মের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। একপর্যায়ে আজম খান অসুরকে দেখিয়ে বলেন- ইয়ে কোন হ্যায়? পুরোহিতের জবাব অসুর। প্রশ্ন করেন ইয়া কিয়া কর রাহা? পুরোহিতের জবাব ও দেবিকা সাথ ফাইট কর রাহা। গভর্নর কারোর কিছু বুঝে ওঠার আগেই- শালা বেতমিজ, আওরাত সাথ ফাইট কর রাহা বলেই হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে অসুরের গলা ধরে দেন টান। ভেঙে যায় অসুরের মুন্ডু। পুরোহিতরা হাতজোড় করে বলেন, হুজুর মূর্তি ভেঙে গেছে। ভাঙা মূর্তি দিয়ে তো পুজো হবে না। আজম খান বুঝলেন তার ভুল হয়ে গেছে। পকেট থেকে টাকা বের করে দিয়ে বললেন নয়া মূর্তি বানাও। মগার অসুর মতো বানাও। ও শালা বেতমিজ। আওরত সাথ ফাইট করতা।

ক্ষমা প্রার্থনা : গত বুধবারের 'মাজার ভাঙার পিছনে কাদের কালো হাত' শীর্ষক কলামে মরহুম মাঈনউদ্দিন খান বাদলের নাম ভুল করে মহিউদ্দিন খান বাদল ছাপা হয়েছে। বাদল ভাই আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। তার নাম ভুলভাবে ছাপা হওয়ায় ক্ষমা চাচ্ছি পাঠক এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার কাছে।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও সংরক্ষণ

ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

২ ।(১০ পাতার পর)

প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরাই আবার এও দাবি করে থাকেন যে, তাঁদের ধর্মটাই আদি, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই অবশ্য দুটো বিষয় নির্দেশিত রয়েছে: (১) ইহলোকে শান্তিতে জীবন যাপন করার "সঠিক" পথ, এবং (২) পরলোকে আত্মার চিরশান্তি নিশ্চিত করার পাথেয় অর্জনের মোক্ষম উপায়। তা'ছাড়া, প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী দাবি করে যে, তাঁদের স্বীয় ধর্মগ্রন্থটি বিশুদ্ধ, একমাত্র কমপ্লিট কোড বা ম্যানুয়েল অফ্ লাইফ।

হিন্দুদের কিন্তু এমন কোন একটি পুস্তক নেই, যাকে ইহলোক এবং পরলোকে শান্তিপূর্ণ জীবনের পথ নির্দেশক। হয়তো বলবেন,– "স্কুলে পাঠ্য হিন্দু ধর্ম শিক্ষার বই রয়েছে, বেদ বেদ্ন্ত-উপনিষদ রয়েছে, শ্রীমদ্ ভাগবৎ গীতা রয়েছে, সেগুলো ছোটদের হাতে তুলে দিন। নিশচয়ই শিশুরা সেগুলো মুখস্ত করে গড় গড় করে বলেও দিতে পারবে, কিন্ত তার মানে বুঝবে না।

তা'ছাড়া, আমাদের অদ্বৈতবাদ যেমন রয়েছে, দ্বৈতবাদও রয়েছে, যা পরস্পর বিরোধী দর্শন। তার পর রয়েছে "যত মত তত পথ"। ভাগবৎ গীতা উচ্চতর দর্শনের ব্যাপার শিশু কিশোর-কিশোরী বা অল্প শিক্ষিত মানুশষর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, আর এই মূল্যবান গ্রন্থ দৈনন্দিন যাপনের ম্যানুয়েলও নয়। তাই, চাই সরল ভাষায় লিখিত একখানা হিন্দু ধর্মের ম্যানুয়েল, যাতে সনাতন ধর্মের নির্যাসটুকু সহজ ভাষায় লিখে শৈশবেই আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিতে হবে। ঐ পুস্তকটি পাঠ করে তারা বুঝবে তাদের ধর্ম কোন কোন দিক থেকে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় উৎকৃষ্ট। একটি সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার করতেই তো আমাদের ম্যানুয়েল পড়তে হয়, মানব দেহ-মনের মত এত অতি-জটিল একটি যন্ত্র এবং ততোধিক জটিল সামজিক জীবনটাকে সুষ্ঠ ভাবে পরচািলনা করার পাশাপাশি পরলোকে চির শান্তিতে অবস্থান করার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য একটি কমপ্লিট ম্যানুয়েল অফ্ হিউম্যান লাইফ নি:সন্দেহে প্রয়োজন। আর, ম্যানুয়েলটি যেহেতু শিশু-কিশোর-কিশোরীদের হাতে তুলে দিতে হবে, সেটা সরল, সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, রূপকে নয়।

ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও কালোত্তীর্ণতা: হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে লিখিত একটি কমপ্লিট ম্যানুয়েল অফ্ হিউম্যান লাইফকে বিশ্বজনীন হতে হবে–নারী পুরুষ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির সকল গোষ্ঠীর কাছে গ্রহনযোগ্য হতে হবে, যাতে যে কোন ধর্মাবলম্বী এটা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন, যেমন বেদ উপনিষদ, গীতা পাঠ করে হন। কেবল একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর জন্য কল্যানকামী কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বৈরীতা/বিদ্বেষ মূলক, নারী জাতির প্রতি তুচ্ছার্থক ও বৈষম্যমূলক বক্তব্য ও আইন সম্বলিত কোন গ্রন্থকে "পবিত্র" দাবি করে সেটা আজকের যুগের ছোটদের হাতে তুলে দেয়া অর্থহীন হবে। এর জন্য হয়তো সংস্কারেরও প্রয়োজন হবে। একজন কিশোর-কিশোরী বা শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র বা ছাত্রী যখন আমার কাছে জানতে চায় হিন্দু ধর্মের কমান্ডমেন্টগুলো (অবশ্য করণীয়/পরিত্যজ্য) কী কী, কোন গ্রন্থটি হিন্দু ধর্মের কোড় অফ লাইফ হিশেবে ওকে পড়তে হবে, কী কী পালন-অচরণ করতে হবে, তখন আমাকে বোকার মত নিরুত্তর থাকতে হয়।

৩ ।

গাণিতিক কিংবা পদার্থবিদ্যার কনসেপ্ট বোঝানো সম্ভব নয়, তেমনি ছোটদের কিংবা একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে এটা বলা অসঙ্গত, "হিন্দু ধর্ম শেখার জন্য তুমি বেদ, বেদান্ত-উপনিষদ, পুরাণ,মনুশাস্ত্র, রামায়ন-মহাভারত আর গীতা পড়ে ফেল। অমূল্য দার্শনিক তত্বের আধার হলেও ওই গ্রন্থগুলোর আকার ও দুর্বোধ্যতার কারণে সেটা করা যাবে না। ইহুদী ধর্ম গ্রন্থ কাবালা যেমন শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বা অল্প বয়সী তরুণ-তরুনীদেরও পড়তে দেয়া হয় না তেমনি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদান্ত-উপনিষদ বা গীতা তাদের হাতে দিয়ে লাভ নেই। অল্প বয়সে, সংসার জীবনের অভিজ্ঞতাহীন কারও পক্ষে ওসব তত্বকথা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। হিন্দু ধর্মের আকর গ্রন্থসমূহের পাঠোদ্ধার করার জন্য ভালভাবে সংস্কৃত শিখে তবে চূড়ান্ত মেধাবী গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ও গবেষকদেরই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়, আর বয়স্কদের মন্দিরে বসে বসে গীতা ব্যাখ্যাতাদের মুখে বারবার নিজের মাতৃভাষায় অনূদিত শোকগুলোর ব্যাখ্যা শুনে জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে কষ্টকরে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। আর, তা'ছাড়া স্কুলে একটা বিষয় শেখানোর জন্য ছোটদের হাতে তো দশটি বই তুলেও দেয়া হয় না, দিতে হয় একটি।

পরিবেশ থেকে ধর্ম শিক্ষা: পরিবার ও প্রতিবেশ থেকে মানুষ যে হিন্দুধর্ম শেখে, যেমন আমি শিখেছি, তাতে সমস্যা আছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা মাকে প্রদীপ জ্বালাতে দেখা, প্রতি বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ শেষে হলে মায়ের নির্দেশে দেবীকে প্রণাম করে সামান্য ফলাহার আস্বাদন করা, সাল তামামি/হাল খাতা -গণেশ পুজো উপলক্ষে বাবার হাত ধরে বড় দোকানে গিয়ে মিষ্টি খাওয়া। মাঝে মাঝে, পুজোর দিনে স্কুল ছুটি থাকলে, পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র না বুঝে অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে দেব-দেবীদের অঞ্জলী দেয়া, পদ্মপুরাণ পাঠে গিয়ে চাঁদ সওদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী শুনে সাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দেবী মনষাকে প্রনাম করা, পরীক্ষা ফেলের ভয়ে উপবাস করে সরস্বতীকে প্রনাম করা, তেরাস্তার মোড়ে মাঠের দেবতা পুজো দেখা, ঘোর বিপদে, যেমন ঝড়ে ঘরের চালা উড়িয়ে নিতে শুরু করলে, উচ্চস্বরে 'দুর্গা দুর্গা' নাম জপ করা, ইত্যাদি। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গ্রাম-নগর-কীর্ত্তণ শোনা, লুটের মন্ডা-মিঠাই লুফে ধরা, পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে পুলি খাওয়া, নারায়ণ পুজো ও শনি পুজোয় প্রণাম করে প্রসাদ খাওয়া, নবান্নে পুজো শেষে উন্নত মানের মুখরোচক খাবার খাওয়া এই সব পরিবেশে রয়েছে। লেখাপড়ার চাপ কম থাকলে, রামায়ন পাঠ শুনতে যাওয়া, দুর্গা পুজোয় নাট মন্দিরে বসে বসে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়া শোনা, ঢাকের বাদ্য শোনা, ধনুচি নৃত্য দেখা, প্রসাদ খাওয়া, নাটক-যাত্রা পালা দেখা, রেডিওতে পুজোর নতুন গান শোনা, পুজো সংখ্যা দেশে গল্প কবিতা পড়া, লক্ষ্মী পূর্ণিমা এবং দীপান্বিতা ও ভাই ফোঁটায় বাহারি নাড়ু-সন্দেশ খাওয়া এসবও আছে। শ্রাদ্ধশান্তিতে বাবার হাত ধরে নিমন্ত্রনে গিয়ে ভাল মন্দ খাওয়া; বিয়ের নিমন্ত্রনে গিয়ে অর্থ না বুঝে মন্ত্র শোনা–"যদ্যেত হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।," এবং সাত-পাক দেখা। পুজোয় পাঁঠা কিংবা মহিষ বলী দেখে কষ্ট ও ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া–এবং বাবার কাছে এ'সবের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা। বৈষ্ণব অত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশী থাকলে, কার্ত্তিক মাসে ভোরে ওঠে মন্ডপে বসে "প্রভাত সময়ে শচীর অঙ্গিনার মাঝে গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে/ জাননি গো শচীমাতা গৌর আইলা প্রেমদাতা, ঘরে ঘরে.হরিনাম বিলায় রে" কীর্ত্তণ শোনা এবং নারকলের তখতি খাওয়া। আর, যদি বাবা নিজে জানেন এবং শেখান তবে সূর্য প্রণাম মন্ত্র শেখা, ব্রাহ্মণ হলে গায়ত্রী মন্ত্র এবং সন্ধ্যা অহ্নিক শিখে মন্ত্রের অর্থ না জেনে-বুঝে আওড়ানো। আর, সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ইউ টিউবের সুবাদে অঘোরীদের নাচ, শ্মশান কালী পুজো, কুম্ভ মেলায় মানুষের ভীড় ও সাধুদের পদচারণা, চড়ক পুজো, রথ টানার দৃশ্য দেখাও পরিবেশ থেকে দেখা ইত্যাদি সবই পরিবেশ থেকে শেখা হিন্দু ধর্ম-কর্ম। তবে, এগুলোর কোনটা যে ধর্মকর্ম, কোনটা সংস্কৃতি, আর কোনটা কুসংস্কার বলা কঠিণ।

উক্ত "ধর্ম-কর্ম"সমূহ ছাড়াও, স্কুলে কলেজের সহপাঠী, বিদ্যাসাগর সমগ্র পড়ে, সংবাদপত্র পড়ে, কিংবা সিনেমা (যেমন "অন্তর্জলী যাত্রা") দেখেও আমাদের ধর্ম শিক্ষা হয়। এ'সব থেকে আমরা জানি যে কৌলীন্য প্রথার নামে নাবালিকাকে অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে বিয়ে দেয়া হত এবং ওই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর বিধবা শিশুটিকে তার বাবা-কাকা-ভাই সবাই মিলে জোর যবরদস্তি করে জীবিত চিতায় (সতীদাহ) তুলে দেয়া হত, আর সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে বিধবাদের পুনর্বিবাহের সুযোগ না দিয়ে (পুরুষের যত খুশি করতে বাধা নেই) বাপের-ভাইয়ের বাড়িতে কার্যত: দাসীর মত থাকতে দেয়া হত, কারণ পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তো তার কোন অধিকার নেই। এ' ছাড়া আরও জানা যায় যে, নারীকে শাস্ত্র পাঠ ও পুজো-পার্বণ করতে দেয়া হত-**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও সংরক্ষণ

ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

(১৮ পাতার পর) না-হয় না, প্রতি মাসে তার ঋতুস্রাবের সময় অপবিত্র বলে অপাঙ্কতেয় করে রাখা হয়, এমনকি গরুঘরে থাকতে বাধ্য করা হয়

৪ ।

কোন কোন এলাকায়; “নিচু” জাতির মানুষকে এখনও অবহেলাও ঘৃণা করা হয়, আর সবই হিন্দু ধর্মের নামে। এ’সব শুনলে, দেখলে বা জানলে নিজের ধর্মটাকে নিয়ে গর্ব করার মত কী বা থাকে! কিছুই থাকে না। একজন শিশু-কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণী বরং লজ্জিত এবং অপরাধী বোধ করে। আমি তো করেছি।

বাংলাদেশের স্কুলে, বৈরী পরিবেশে, যখন একটি হিন্দু শিশু/কিশোর বা কিশোরীকে তার মুসলমান সহপাঠীরা বলে যে তারা গাছ-পালা ও গরু উপাসক, গোবর খেকো গো-মূত্রপায়ী তখন একজন শিশু-কিশোরের মারাত্মক মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়, কারণ সে হীনমন্যতায় ভূগতে শুরু করে। একজন হিন্দু শিশু ধর্মের নামে যে মানবতা বিরোধী কাজ করতে শেখে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, “নিচু” জাতের হিন্দুদের ঘরে খাওয়া যাবে না, খাওয়ার সময় ওরা ভুল করে ছুঁয়ে দিলে সারা দিন উপবাস করে সন্ধ্যায় বিনা লবনে ফেনভাত খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তাদের ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না, অসবর্ণে বিয়ে করা যাবে না, খরাক্লিষ্ট মুচি মেথর পুকুর থেকে জল তুলে নিলে কঠিন শাস্তি দিতে হবে (ভারতবর্ষের কোন কোন এলাকায় তাদের পাড়া আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলার রেওয়াজ আছে, আর উঁচু জাতের ছেলের সঙ্গে নিচু জাতের মেয়ের প্রেম হলে তো মেয়ের গোষ্ঠীসুদ্ধ সকলকে হত্যাও করা যায়)। এ’সব অধর্ম বা নিষ্ঠু রতার উত্তরাধীকারে গর্বের তো কিছু নেই,বরং হীনমন্যতা বোধটা ধীরে ধীরে বাড়ে।

উক্ত মানবতা বিরোধী আচরন ও অনুষ্ঠানগুলো কি হিন্দু ধর্ম?

ধর্ম শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তো সংসার জীবন পরিচালনার রোড ম্যাপ এবং আত্মার মুক্তির উপায় নির্দেশ করা, তাই না? ওসব থেকে একজন শিশু/কিশোর-কিশোরী কী শেখে? শিশুদের কেউ শেখায় না ধর্ম কি, সংস্কৃতি কী আর কোন ঐতিহাসিক কারণে হিন্দু সমাজে কোন অমানবিক অপসংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল, এবং এ’সবের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের যে কোন সম্পর্ক নেই–এ’সব বর্বর, অমানবিক অপসংস্কৃতি এবং সর্বাবস্থায় পরিত্যজ্য।

ছোটদের জন্য কিংবা অহিন্দু যারা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানতে বা গ্রহন করতে আগ্রহী তাদের জন্য যে ম্যানুয়েল অফ লাইফ লেখার জন্য অমি শাস্ত্রজ্ঞদের অনুরোধ করি সেই পুস্তকটিতে জীবন যাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ রোড ম্যাপ এবং আত্মার মুক্তির উপায় সরল ভাষায় নির্দেশিত থাকা চাই, যাতে এর পাঠোদ্ধার করতে কারও পন্ডিতের কাছে যেতে না হয়ঃ ছোটরাও যেন পুস্তকটি নিজে নিজে পড়েই ব্যক্তিগত জীবনে চর্চা করতে পারে। এই ম্যানুয়েলটি পড়লে শিশু -কিশোর-কিশোরীরা জানবে সতীদাহ, কৌলীন্য প্রথা, জাত-পাত প্রথা হিন্দু ধর্মের অংশ তো নয়ই হিন্দুদের মূল ধারার সংস্কৃতিও নয়, বরং কোন কোন এলাকায় আগাছার মত বেয়ে ওঠা কিছু আসুরিক অপ-সংস্কৃতি। তারা আরও জানবে যে আমরা বহু ঈশ্বরের উপাসক নই গো-উপাসক নই -- আমাদের ধর্মগ্রন্থ স্পষ্টভাবে বলে ঈশ্বর ’একমেব অদ্বিতীয়ম”, যিনি সর্ব জীবে, সর্বত্র বিরাজমান। এই বইটি পড়লে তারা জানবে যে, হিন্দুরা আদি থেকেই বলে এসছে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি সচল, বোকার মত বলেনি সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, কোপার্ণিকাসের সৌর-কেন্দ্রীক বিশ্ব ব্যবস্থার করায় হিন্দুরা গেলেলেওকে নির্যাতন করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়নি। এই পুস্তকটি পড়ে তারা হিন্দু ধর্মেগ্রন্থ সমূহে রক্ষিত বৈভব দেখে এর বিশ্বজনীনতা ও মানবতাবোধ স্বধর্ম নিয়ে গর্বিত বোধ করবে।

এই পুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়েজনীয় স্থলে অব্যশ্যই সংস্কারও করতে হবে। ওল্ড টেস্টামেন্টের (বাইবেল), যাতে ন্যায়-বিচারের মূল মন্ত্র ছিল চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত” সেটাকে সংস্কার করে নিউ টেস্টামেন্ট এসছে ঠিক এর বিপরীত কমান্ডমেন্টঃ তোমারা সবাই পরস্পরকে ভালবাস, ঈশ্বর মানেই ভালবাসা বা প্রেম, যা আমাদের চৈতন্যদেবও প্রচার করেছেন, আর বিবেকানন্দ কী বলেছেন সে তো সকলেরই জানা -- “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।” নেলসন মেন্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান রিফর্ম করে একটি চমৎকার মানবিক সংবিধান সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম তো জীবনের সংবিধান, একেও সংস্কার করা যায়। হিন্দু ধর্মের সকল আকর গ্রন্থ থেকে সারাৎসার আহরণ করে, আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধর্মাশ্রয়ী অংশে যে বর্জ্য বা অপসংস্কৃতির আগাছা জন্মেছে সে’সব ব্যাখ্য পূর্বক বর্জন করে সরলভাষায় লিখিত একখানা ম্যানুয়্যাল অফ্ হিন্দু লাইফ বা হিন্দু ধর্ম প্রবেশিকা আমাদের জরুরী প্রয়োজন।

শিক্ষা অল্প বয়সে শুরু করলেই ভাল হয়। কারণ, কর্ম জীবন শুরু হলে, সংসার হলে সময় কোথায়! তাই, আমি সুযোগ পেলেই ম্যানুয়েলটি লেখার জন্য হিন্দু-শাস্ত্রজ্ঞদের অনুরোধ করি। এই অনুরোধটা আমি প্রথম করেছিলাম আমার দূরাত্মীয় কিন্তু অত্যন্ত কাছের মানুষ স্বর্গীয় জয়কুমার তর্ক-বেদান্ত-ষড় দর্শন কাব্যতীর্থকে, এবং সর্বশেষ করেছি নিউইয়র্কবাসী

৫ । চধমব

ধর্মপ্রাণ একাধিক সুহৃদকে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন হিন্দু ধর্ম একটা বিশাল অরণ্যের মত সুন্দর, এটাকে এভাবেই থাকতে দেয়া উচিৎ। যত মত তত পথই ভাল; সংস্কার করে একটি শিশু/কিশোর-কিশোরী -পাঠ্য পুস্তকে এমন মহান একটি ধর্মকে ধারণ করা সম্ভবও নয়, উচিৎও নয়। আমি সেটা মনে করি না; আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজের মত বিদগ্ধ বাঙালী পন্ডিতের পক্ষে সহজেই এ’ কাজটি করা সম্ভব।

নামকরণঃ ওপরে যেমনটা বলেছি, বর্ণাশ্রম প্রসূত জাত-পাত প্রথা ক্রীতদাস প্রথা বা বর্ণবৈষম্যবাদের মতই মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ। এই কলঙ্কের বোঝা বহন করে আমাদের লাভটা কী হচ্ছে! এর অপনোদন চাই, আর সেটা সরকার উদ্যোগ নিলে সহজেই করা সম্ভব। ধরুন প্রসেঞ্জিৎ বর্ম্মন সজ্জন, সুদর্শন এবং তুখর মেধাবী তরুণ ডাক্তার, কিন্তু বামুন, বদ্যি, কয়েস্থ কোন মেয়ে ওকে বিয়ে করতে পারবে না (ওর পছন্দের মেয়েটি ব্রাক্ষণ) অথচ, প্রসেঞ্জিতের পিতা প্রণয় বর্ম্মন ও মা পৃথা গায়েন যদি প্রণয়ের নাম করণ করতেন “প্রণয় পৃথা প্রসেন্‌জিৎ “ তা’হলে “ছোট” জাতের মানুষ বলে প্রণয়কে তার পছন্দের “উঁচু জাতের” মেয়েটি তাকে প্রত্যাখ্যান করত না।

নিরাপদ হোক শারদোৎসব কামাল লোহানী ব্রিটিশ আমলে দেশের লোকসংখ্যা কম ছিল; তবুও শারদীয় উৎসব আয়োজন ছিল নিরাপদ ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সৌভ্রাতৃত্বের মিলন মেলা বসত উৎসব ঘিরে। আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটত প্রতিমা দর্শনে। আবার উৎসবের মেলা প্রাঙ্গণে পসরা সাজিয়ে বসা নানা দোকানির কাছ থেকে নিজেদের চাহিদা পূরণের মতো কিছু কিনত। দেশ হলো বিভক্ত, বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হলো। আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ- হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান চাইলাম এক হয়ে বাস করতে আনন্দ-উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে। পাকিস্তানি দুঃশাসনের বৈরী মনোভাব দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ’সংখ্যালঘু’ বলে চিহ্নিত করল। তবু দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যকে ম্লান করতে পারেনি। বাংলা এখন সাড়ে চার কোটি নয়, সাড়ে সাত কোটিও নয়, ১৬ কোটি গণমানুষের দেশ। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের কালে আমরা দখলদার পাকিস্তানিদের পরাজিত করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করেছি ৩০ লাখ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসীর রক্তে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং মুক্তিফৌজ তথা মিত্রবাহিনী বিজয় অর্জন করেছে। আর তাই আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের সৌগানে অর্জন করেছি ’গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’। এ অর্জনের আগে ও পরে কত না চক্রান্ত একে ম্লান করতে চেয়েছে। দেশি-বিদেশি হাত খর্ব করতে চেয়েছে মুক্তিসংগ্রামকে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে অপপ্রয়াস। আমরা বিজয়ী বাংলার মানুষ মুক্ত স্বদেশে বসবাস করছি আজ প্রায় ৫০ বছর। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার যে সৌগান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শানিত করেছিলাম শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে, তা আজ যেন কেমন ফিকে হয়ে গেছে। জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর ওপর নানা ধরনের অত্যাচার, ভূমিগ্রাস, সম্পদ লুট, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এমনকি হত্যার ঘটনাও ঘটাল- এক নয়, একাধিকবার। এই তিন আমলে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বাড়াবাড়িতে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৎপরতায় মন্দিরে, গির্জায় এমনকি প্যাগোডাতেও হামলা করতে দ্বিধাবোধ করল না। একের পর এক এ ধরনের সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের ফলে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আতঙ্ক ও আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল। ফলে দেশত্যাগ করতে থাকলেন তারা। উল্লেখ্য, শারদীয় দুর্গোৎসব আয়োজনের পরিমাণ অনেক কমে গেল। যারা এ দেশেই থেকে গেছেন, তারা সাহসে ভর করে পূজামণ্ডপ নির্মাণ ও দেবী প্রতিমার উদ্বোধন ঘটিয়ে পূজা অর্চনা করতে চেষ্টা করেছেন। সরকার তাদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তারপরও বেশ কিছু জায়গায় দুর্বৃত্ত ও ভূমিগ্রাসী লুণ্ঠনকারীর দল রাতের অন্ধকারে মন্দিরে সাজানো দেবী প্রতিমাকে ভেঙে পূজার আয়োজনকে তছনছ করে দিয়েছে। আবার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হিন্দু বাড়িঘর, দোকানপাট যেমন লুট করেছে, তেমনি গির্জার ধর্মযাজককে হত্যা করেছে অথবা হত্যার হুমকি দিয়েছে। ফলে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শঙ্কা সবসময় বিরাজ করেছে। কিন্তু আজ যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতন-াসমৃদ্ধ সরকার ক্ষমতাসীন এবং তাদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতি ’জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণের পর অমুসলিম জনগণের অনেকেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অজুহাতে হিন্দুদের বিষয়-সম্পত্তি ’শত্রু সম্পত্তি’ হিসেবে আইয়ুব সরকার দখল করে নিয়েছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বিজয়ের পর দখলকৃত এসব সম্পত্তি তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। দেশে অর্পিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার যে নির্বাচনী ওয়াদা ১৪ দল করেছিল, শেখ হাসিনার আমলে তার খানিকটা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এখনও অর্পিত সম্পত্তি বিষয়টি আদালতে ফয়সালা হওয়ার পরও প্রশাসন থেকে নানা ধরনের বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকে অর্পিত সম্পত্তি অর্থাৎ আইয়ুবী আমলের ’শত্রু সম্পত্তি’ মামলা করে ফেরত পেয়েছেন। আর সেই সুবাদে যে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, তার কারণে অনেকে আবার দেশে ফিরে এসেছেন। ইতিপূর্বে পূজা-পার্বণে যে ধরনের সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৎপরতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আজ তা অনেকটাই কমে গেছে। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, সনাতন ধর্মের মানুষ নতুন নিরাপদ পরিবেশে আগের চেয়ে অনেক বেশি পূজা-পার্বণে মনোনিবেশ করেছে। তাই তো এবার পূজামণ্ডপের সংখ্যা ৩১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আদিবাসীরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যেভাবে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। তবু দেশের মানুষকে ভালোবেসে যে শান্তির পরিবেশ আজ সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের স্বস্তি দেয়। সরকারি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি সুদৃঢ় হয়েছে বলেই এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তবু সরকারকে বলব সাবধান থাকতে। আমরা তো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোবিন্দগঞ্জের কথা ভুলে যাইনি, ভুলে যাইনি সাঁথিয়ার কথাও। এমনিভাবে ভোলা কি সম্ভব এ ধরনের কুৎসিত অপতৎপরতাকে? তাই সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার জন্য সাধুবাদ জানাই। তারপরও অনুরোধ জানাব মণ্ডপে মণ্ডপে নজরদারিটা বাড়ানোর জন্য। আর সেই সঙ্গে পূজা বা উৎসব কমিটির কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদেরও অনুরাধ করব স্থানীয় জনগণের সহায়তা নিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এত সব শঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যেও যারা পূজা-পার্বণের আয়োজন করেছেন, তাদের জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সার্বজনীন মঙ্গল উৎসব

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাঙালি সংস্কৃতি এই বাংলার জল, মাটি, পলি, মানুষ- এসব কিছুর সম্মিলন থেকেই উঠে এসেছে। এই উঠে আসার মধ্য দিয়ে আমরা চিনেছি বাঙালি সংস্কৃতি। মূলত এখানে বসবাসকারী মানুষদের, যাদের আমরা বলি আদি বাঙালি সমাজ কিংবা তার পরের যুগের বাঙালি কিংবা আধুনিক বাঙালি এবং সাম্প্রতিক সময়ের বাঙালি। এই প্রক্রিয়া ধারার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করি, মানুষ তার ভাষায়, আচার-আচরণে, তার বিশ্বাস এবং তার সম্পর্ক এসব কিছু মিলিয়ে কোন কোন পদ্ধতিতে তারা জীবনযাপন করছে। একটা পদ্ধতি হলো, যেখানে জন্ম নিয়েছে তারপর সেখানে তার বসবাস, ভিটাবাড়ি এরপর তার অনেক সংস্কার। সংস্কারের পাশাপাশি তার আছে সংস্কৃতি। এই সংস্কার তার সামাজিকতায়, বিশ্বাসে, আচরণে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে, নানাভাবে।

এর মধ্যে কিছু আছে সার্বজনীন, যে বিষয়গুলো ধর্ম-বর্ণ সবকিছু ছাড়িয়ে প্রকৃতিনির্ভর, আমাদের

অরণ্যনির্ভর, সমাজ কাঠামোর বন্ধননির্ভর এবং আমাদের মানবিক সম্পর্কনির্ভর। তেমনি এক ঋতু-ভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক, আচারভিত্তিক এবং সার্বজনীন মঙ্গলভিত্তিক একটি উৎসবের নাম শারদীয় দুর্গোৎসব। এর সঙ্গে জড়িত আছে আদি বা সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালি বিশ্বাস, দেব-দেবীর পূজা অর্চনা এবং মানুষের মাঙ্গলিক সত্তা। দেব-দেবীকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা করেন। তারা দেব-দেবীর আরাধনা করেন। এই বিষয়গুলো হয় নানাভাবে। কখনও মূর্তি আকারে স্থাপন করে আবার কখনও কোনো আকারে না গিয়ে নান্দনিক আকারবিহীন সত্তার ভেতর দিয়ে দেখে। পার্থক্য শুধুই এটুকুই। বাকি যেটুকু তা হলো, মানুষে মানুষে সম্পর্কিত সত্তা, বন্ধন, ভালোবাসা, প্রীতির ছায়া। বাঙালি জাতির বৈচিত্র্যময় জীবনাচার, সংস্কৃতি সবকিছুই তো অত্যন্ত উৎকর্ষ। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও একই সঙ্গে যে সংস্কৃতি ধারণ করে চর্চা করে চলছে বাঙালি, এর মধ্যে সার্বজনীনতাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

শরৎ আমাদের ষড়ঋতুর মধ্যে এমন একটি ঋতু, যে ঋতুতে গরম কম, এই রোদ কিংবা এই বৃষ্টি কিংবা জল আছে কিন্তু জলও কম আবার শীত আছে কিন্তু তাও কম। অর্থাৎ, সবচেয়ে সহনীয় একটা ঋতু। আমাদের প্রকৃতিগত এই পরিবর্তন ঘিরে বাঙালি সমাজে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো বাঙালি সমাজে আধিবাসীদেরও বসবাস। সনাতন ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এমনকি আদিবাসী সবাইকে নিয়েই তো আমাদের সম্প্রীতির সমাজ কাঠামো। আদিবাসীদের জীবনাচারে প্রাকৃতিক বিষয়গুলো খুব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আমাদের সবারই এই কাঠামোবদ্ধ সমাজে বসবাস কিংবা জীবনযাপন এসব ঘিরেই নান্দনিকও। আমাদের আদিতে আছে কৃষি সভ্যতা। কৃষি সভ্যতার সঙ্গে বাঙালি সভ্যতার, বাঙালির আচার ইত্যাদির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ধান, দূর্বা, ফুল, জল ইত্যাদি কত কিছুই তো প্রকৃতির উপাদান। আমরা যখন পবিত্র জল ছিটাই কিংবা গঙ্গা থেকে পবিত্র জল আহরণ করি, সবকিছুতেই উদারমনস্ক বাঙালিরা সুন্দর ও স্বচ্ছতারই অনুসন্ধান করে।

যদিও একটি সম্প্রদায় কিংবা ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বলা যায় এই শারদীয় দুর্গোৎসব, কিন্তু এই উৎসবের সার্বজনীন ও মাঙ্গলিক দিক আছে যা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার, সম্প্রীতির বন্ধন মজবুত করার বড় সূত্র। তেমনি বুদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা, খ্রিষ্টানদের বড়দিন, মুসলামনদের ঈদ এই প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এর সার্বজনীনতাও এখানে গভীরভাবে দৃশ্যমান। সব ধর্মের মধ্যেই এই মাঙ্গলিক সার্বজনীন বিষয়টি রয়েছে। আমরা সম্প্রীতির বন্ধন আরও মজবুতকরণের বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্ব দিই। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও ডাকে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এই আকুতি আরও পুষ্ট হয়েছে। আমাদের মাঙ্গলিকতা ও মিলনের সেতু হলো এই বোধটুকুই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শারদীয় উৎসব নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা যেমন সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন চাই, তেমনি চাই মঙ্গল কিংবা কল্যাণের ক্ষেত্রও আরও প্রসারিত হোক। ক্রমাগত হতেই থাকুক। এই জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারগুলো ছিল, সেই অঙ্গীকার ধারণ করে, চর্চা-অনুশীলন করে সব অশুভর ছায়া অপসারণ করা সম্ভব। আমাদের সংস্কৃতি সব উৎসবের ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। উৎসবের আলোয় আলোকিত হোক চারদিক।

লেখক :বিশিষ্ট কবি; মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

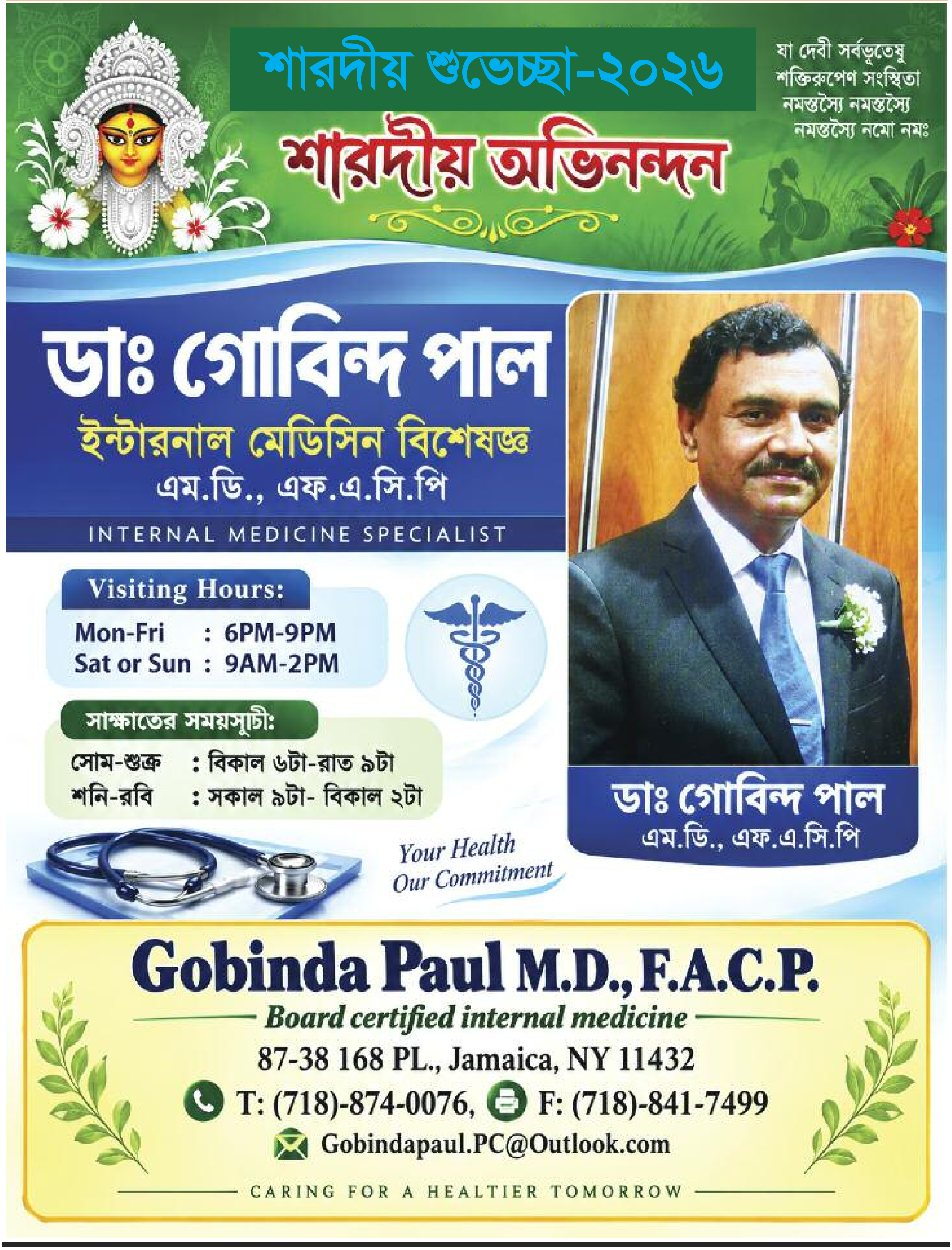

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

শারদীয় শুভেচ্ছা ২০২৬

যা দেবী সর্বভূতেষু
বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

শুভেচ্ছান্তে,

প্রিয়তোষ, বীণাপানি, প্রিয়াতা, নিকিতা দে

দুর্গে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। ওঁ শান্তি!!

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬

বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য আপনার প্রয়োজন দক্ষ, সৎ বিশ্বস্ত এজেন্ট

সুখেন গমেজ

লাইসেন্স রিয়েল এস্টেট এজেন্ট

929 395 8430
347-846-1200
347-846- 1569
Sukhen.gomes@gmail.com
Sukhen.kw.com
Sukhen Gomes Real Estate
Sukhen Gomes Keller Williams
Sukhen.gomes.real.estate
@GomesSukhen
Sukhen Gomes

RE/MAX LuXe

75-35 31st Avenue, Suite:202,Jackson Heights,NY- 11370

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

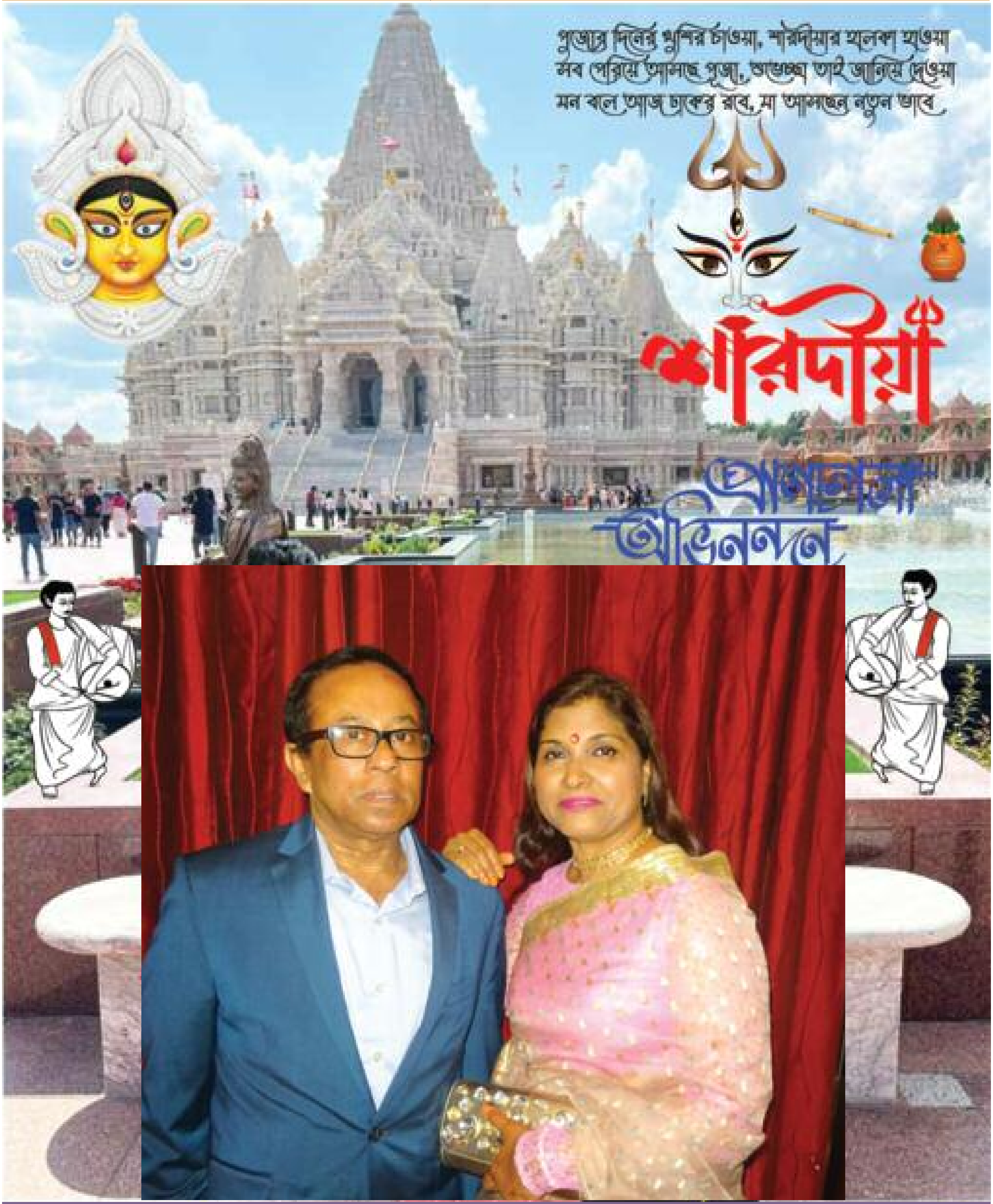

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী দীপক রায় ও শ্রীমতি সীমা রায় ; নিউইর্য়ক।।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

আগামী শরতে মা আসুক শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে

প্রদীপ মালাকার

আজ দেবী দুর্গার বিসর্জন। কয়েক দিনের উৎসব, আনন্দ, প্রার্থনা ও মিলনমেলার পর আবারও বিদায়ের সুর। মণ্ডপে মণ্ডপে বাজছে বিষাদের ঘণ্টা, ভক্তদের চোখে অশ্রু, মনে একরাশ আবেগ। ঢাকের বাদ্য, ধূপের গন্ধ, শঙ্খধ্বনি আর আরতির আলোয় যে উৎসবমুখর দিনগুলো কেটেছে, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটছে। দেবী দুর্গা ফিরে যাচ্ছেন কৈলাসে, রেখে যাচ্ছেন অগণিত ভক্তের হৃদয়ে ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও নতুন দিনের প্রত্যাশা। কিন্তু মায়ের এই বিদায় কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবের সমাপ্তি নয়; এটি আমাদের সামনে নতুন করে একটি প্রশ্নও তুলে ধরে- বাংলাদেশে সব ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের বন্ধন কতটা অটুট রাখতে পেরেছি আমরা?

দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা শক্তি, সাহস, কল্যাণ ও অশুভের বিরুদ্ধে শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক। পুরাণের কাহিনিতে মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবীর বিজয় অন্যায়, অন্ধকার ও অশুভ শক্তির পরাজয়ের বার্তা বহন করে। এই প্রতীকী তাৎপর্য কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে রয়েছে সর্বজনীন মানবিক আবেদন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, দুর্বলের পাশে থাকা, অশুভকে পরাজিত করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা সব মানুষের জন্যই প্রাসঙ্গিক।

সেই অর্থে দুর্গোৎসবের আনন্দ ও তাৎপর্যকে আমরা বৃহত্তর মানবিক মূল্যবোধের আলোকে দেখতে পারি। একটি সমাজ তখনই সুন্দর হয়ে ওঠে, যখন সেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, ভালোবাসা জয়ী হয়; প্রতিহিংসা নয়, সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয়; ভয় নয়, নিরাপত্তা মানুষের জীবনকে পরিচালিত করে।

বাংলাদেশ এমন একটি ভূখণ্ড, যার জন্মের ইতিহাসে বহুত্ববাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এ দেশের নদী, মাটি, প্রকৃতি, লোকসংস্কৃতি, গান, কবিতা ও উৎসবের মধ্যে মিশে আছে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের অবদান। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা পর্বে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে রয়েছে।

একজন প্রতিবেশীর উৎসবে অন্য প্রতিবেশীর অংশগ্রহণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, বিপদের দিনে ভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশে দাঁড়ানো- এসব সাধারণ দৃশ্যই বাংলাদেশের সামাজিক সম্প্রীতির প্রকৃত শক্তি। এই শক্তি কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সম্পর্ক ও মানবিক আচরণের মধ্যেই বেঁচে থাকে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেখানে কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই আনন্দ ভাগ করে নেন না; বিভিন্ন ধর্মের মানুষও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, মণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং উৎসবের আনন্দে শামিল হন। শহর থেকে গ্রাম- বহু জায়গায় এই পারস্পরিক অংশগ্রহণ বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সমাজের সৌন্দর্যকে তুলে ধরে। উৎসব তখন আর একটি সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আটকে থাকে না; তা হয়ে ওঠে মানুষের মিলন, সংস্কৃতির বিনিময় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপলক্ষ।

যদিও সম্প্রীতির এই চিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ কাজ নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব, ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে উসকানি, রাজনৈতিক স্বার্থে বিভাজন সৃষ্টি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ- এসব বিষয় আমাদের সতর্ক করে দেয়। কোনো একটি সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা, উপাসনালয়ে আক্রমণ, প্রতিমা ভাঙচুর কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কাউকে ভয়ভীতির মধ্যে রাখা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত করে না; তা পুরো সমাজের মানবিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মূল্যবোধের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হলে রাষ্ট্র, প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ নাগরিক- সবারই দায়িত্ব রয়েছে। যে কোন পূজামণ্ডপ ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকার নাগরিক দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সম্প্রীতির স্থায়ী ভিত্তি কেবল নিরাপত্তাব্যবস্থা দিয়ে নির্মিত হয় না; তা গড়ে ওঠে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বোধের ওপর। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে- ধর্মীয় পরিচয় মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অংশ, কিন্তু মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সবার নৈতিক দায়িত্ব। অন্যের ধর্মকে অবজ্ঞা করে নিজের ধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বরং কিভাবে নিজের বিশ্বাসে অবিচল থেকেও অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা যায়- সেখানেই উদারতা ও মানবিকতার প্রকৃত পরিচয়।

আমেরিকা প্রবাসী শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

দেশ ও প্রবাসে শারদীয় দুর্গোৎসবে মুখরিত

মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করেন।পূজার শুরুতে ঢাক-ঢোল, শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে মন্ডপ। ‘কুমারী মায়িকি জয়, দুর্গা মায়িকি জয়’ ধ্বনিতে কুমারী দেবীকে মণ্ডপে আনা হয় এবং দুর্গা প্রতিমার সামনে বেদিতে বসানো হয়। পুরোহিত ও ভক্তরা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পঞ্চ উপকরণে কুমারী দেবীকে আরাধনা করেন।

পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার ষষ্ঠীপূজার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। রোববার,(২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫) মন্দিরের দুর্গামন্ডপের সামনে থাকা বেলতলায় চন্ডীপাঠ ও বিহিত পূজা হয়। ঢাকের বাদ্য, শঙ্খনাদ, উলুধ্বনি, কাসর ঘণ্টার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে আবাহন করা হয়। সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তরা আসতে শুরু করেন। কেউ কেউ অঞ্জলি দিয়েই চলে যান। আবার কেউ কেউ প্রার্থনার পর পরিবার নিয়ে সময়ও কাটান।

ঢাকের বাদ্য, উলুধ্বনি, শঙ্খনাদ আর কাসর ঘণ্টায় মুখরিত ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির। সেখানে দেবীদুর্গাকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকে অনেকেই ছিলেন অপেক্ষায়। রোববার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে বেলগাছের নিচে ঘট স্থাপন করে ষোড়শ উপাচারে ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভে ষষ্ঠী পূজা শুরু হয়। এর আগে ভোর থেকে চলতে থাকে পূজার সরঞ্জামাদি সাজানোর কাজ।

ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। যার সমাপ্তি হবে বিজয়া দশমীতে দেবীদুর্গার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। স্বামীর ঘর স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে তার পিতৃগৃহে পদার্পণ করলেন দেবী। এ আগমনে তার সঙ্গে রয়েছেন চার ছেলেমেয়ে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী, আরও রয়েছে কার্তিকের কলা বউ। সাধারণত ষষ্ঠীর দিন ‘দুর্গা মায়ের’ মুখ উন্মোচিত করা হয়, এ সময় লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতীকে নিয়ে দেবী দুর্গা মন্ডপে অধিষ্ঠিত হন।

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রতি শরতে কৈলাস ছেড়ে কন্যারূপে মর্ত্যলোকে আসেন দেবীদুর্গা। তার এ ‘আগমন ও প্রস্থানের’ মাঝে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে দুর্গোৎসব।

মহালয়ার মধ্য দিয়ে গত ২১ সেপ্টেম্বর এবারের দুর্গোৎসবের ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছিল। ওইদিন থেকেই দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতার সূচনা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, দশভূজা দেবী দুর্গা অসুর বধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধরায় আসেন। সন্তানদের নিয়ে কয়েকটি দিন পিতার গৃহে কাটিয়ে আবার ফিরে যান দেবালয়ে। তাদের বিশ্বাস, ত্রেতাযুগে ভগবান রাম তার স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করতে দেবী দুর্গার অকালবোধন করেন। ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী দুর্গার সাহায্যে রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেন তিনি। দেবীর সেই আগমণের সময়ই দুর্গোৎসব। রাম শরৎকালে দেবীকে আহ্বান করেছিলেন বলে এ পূজা শারদীয় দুর্গা পূজা নামেও পরিচিত।

এবারের পূজায় কেবল ঢাকাতে গতবারের তুলনায় ৭টি বেড়ে মোট ২৫৯টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর সারাদেশে মোট মন্ডপের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৩৫৫টি, যা গতবারের তুলনায় প্রায় হাজারখানেক বেশি।

নিউইয়র্কে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে ১৭শে অক্টোম্বর শনিবার থেকে

নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে ২৭ শে সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে। এবার নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার বড় বড় শহর শিকাগো, লসএঞ্জেলস্ মায়ারি, ওয়াশিংটন, নিউজার্সি, ভার্জেনিয়াসহ ফ্লোরিডা মিলে প্রায় শতাধিক দুর্গাপূজার খবর পাওয়া গেছে। আমেরিকার প্রতিবেশী কানডার মন্ট্রিল, টরেন্টু অটোয়া, কেলগেরীর সহ অনেকগুলি দুর্গাপূজার আয়োজন চলছে। বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। প্রতি বছরের অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের এ উৎসব এ বছরও পালিত হচ্ছে। একদিকে শারদোৎসব হলেও এবার দুর্গাপূজা পালন হচ্ছে বর্নীল উৎসবের ছন্দে। আলোকসজ্জা, সাজসজ্জাসহ উৎসব ও পূজার সাত্বিক আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে পূজামণ্ডপ। এবারের দুর্গোৎসবকে জাতীয় পূজা উদযাপন পরিষদ আড়ম্ব্বর ও উৎসবে দুর্গাপূজা ভিন্ন আমেজ থাকবে। দেবী দুর্গার পূজা মানেই অশুভ শক্তির প্রতীক অসুরের বিরুদ্ধে শুভশক্তির বিজয়। সে জন্য চিরসুন্দর কল্যাণময়ী মাতৃ রূপের সঙ্গে অসহায় ও নিপীড়িতের আশ্রয়ও তিনি। আর এখানেই শারদীয় দুর্গোৎসব সার্বজনীনরূপে আবির্ভূত। দুর্গাপূজা সার্বজনীন হওয়ার ফলে এর বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটেছে। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতা বেড়েছে। সমাজের ধনী-দরিদ্র সবাই একসঙ্গে মিলে এ উৎসব পালন করার সুযোগ লাভ করেছে। এখানে উঁচু-নিচু কিংবা জাতি-সম্প্রদায়গত ভেদ নেই। দুর্গাপূজার এই সার্বজনীনতা দেবী প্রতিমার রূপ-কল্পনায়ও পরিলক্ষিত হয়। অন্য সব দেবতাই এককভাবে পূজিত হন; কিন্তু দেবী দুর্গা পূজিত হন সমষ্টিগতভাবে।

দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা

অধ্যাপক অরূপ রতন চৌধুরী

মা দুর্গা দূর কৈলাশ ছেড়ে পিতৃগৃহে আসবেন নৌকায়। সনাতন বিশ্বাসে ‘শস্যবৃদ্ধিস্থাজলম’, অর্থ–অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে একদিকে প্লাবন হবে, অন্যদিকে শস্য বাড়বে। দেবী প্রস্থান করবেন ঘোটকে। মা দেবীদুর্গার আশীর্বাদে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করার পর সীতাকে উদ্ধার করলেন, সেই থেকে শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। দুর্গা হচ্ছেন তিনি, যিনি জীবের তথা দেবতাদের দুর্গতি নাশ করেন, আবার দুর্গম অসুরকে বধ করেন।

শরৎকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে সব দেব-দেবীর মতো দেবীদুর্গা বিষ্ণুমায়া নিদ্রিত থাকেন। শারদীয় দুর্গাপূজায় বোধন হচ্ছে নিদ্রিত দেবীকে জাগ্রত করা। শরৎকালে অকাল বোধনের দ্বারা দেবীকে জাগ্রত করা হয় বলে দুর্গার অপর নাম শারদীয়া। শরৎকালে এই দুর্গাপূজা হয়, তাই তাকে শারদীয় দুর্গাপূজা বলা হয়।

চণ্ডীর বর্ণনা অনুযায়ী, দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় দেবী মায়ের নাম হয়েছে দুর্গা। দুর্গম অসুরের কাজ ছিল জীবকে দুর্গতিতে ফেলা। দুর্গমকে বধ করে যিনি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণকে হৃতরাজ্যে ফিরিয়ে দেন এবং দুর্গতির হাত থেকে জীবকে রক্ষা করেন, তিনিই মা দুর্গা। দেবীর ডানে লক্ষ্মী ও গণেশ, বামে সরস্বতী ও কার্তিক। দুর্গা শব্দের অর্থ যিনি জীবের দুর্গতি হনন করেন। আরেকটি অর্থ দুর্জয়া।

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা যুধিষ্ঠির বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য মা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন বলে মহাভারতের বিরাট পর্বের ২৪ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। দুর্গা শক্তিদায়িনী। যুগে যুগে বিভিন্ন সংকটের সময় তিনি মর্ত্যধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে। তিনি তাই আদ্যশক্তি মহামায়া, ব্রহ্মসনাতনী। দুর্গা, মহিষমর্দিনী, শলিনী, পার্বতী, কালিকা, ভারতী, অম্বিকা, গিরিজা, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বাহারী, চণ্ডী, লক্ষ্মী, উমা, হৈমবর্তী, কমলা, শিবানী, যোগনিন্দা প্রভৃতি নামে ও রূপে মায়ের পূজা হয়ে থাকে।

ত্রিনয়নী মহাদেবী দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে আবির্ভূত হন। এ পূজার মূর্তি কল্পনায় ফুটে ওঠে শৌর্য-বীর্য (কার্তিক), জ্ঞানভক্তি (সরস্বতী), সিদ্ধি (গণেশ), সম্পদ (লক্ষ্মী), মানবজীবনের ইহকালের বস্তুলাভ এবং অন্তিমকালে মাতৃক্রোড়ে চির আশ্রয়। আর মায়ের পদতলে মহিষাসুর অশুভ এবং অহংকারের প্রতীক, যা জগতের অমঙ্গলের হেতু। তাকে আবার শাসন করছেন স্বয়ং দেবী, যিনি কল্যাণময়ী বরাভয়দায়িনী হিসেবে জগতের কল্যাণ করে আসছেন।

পূজার ষষ্ঠীতে দেবীর ষষ্ঠাদিকল্প অর্থাৎ আবাহন, বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন হয়। পুরোনো শাস্ত্রমতে, দেবীর বোধন হয় বিল্ববৃক্ষে বা বিল্বশাখায়। অন্যদিকে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিমায় দেবীর অর্চনা করা হয়ে থাকে। পূজার অষ্টমীতে বিশেষ অনুষ্ঠান অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে দেবীর বিশেষ পূজা ‘সন্ধিপূজা’। অষ্টমী তিথিতে কুমারী বালিকাকে পূজা করা হয়। দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারী মন্দিরের কুমারী প্রতিমা পূজা দেবীদুর্গারই ঐতিহ্য বহন করে। ১৯০১ সালের ১৮ অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা করেছিলেন।

কুমারীপূজা মাতৃভাবে ঈশ্বরেরই আরাধনা। কুমারী কন্যাকে জীবন্ত প্রতিমা করে জগজ্জননীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দুর্গাপূজার অষ্টমী বা নবমীতে সাধারণত পাঁচ থেকে সাত বছরের একটি কুমারীকে প্রতিমার পাশে বসিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। দুর্গাজ্ঞানে পূজা করে সবার মধ্যে মাতৃভাবেরই সঞ্চার করা হয়। প্রায় সর্বজাতিয়া কন্যাকেই কুমারীরূপে পূজা করা হয়। তবে স্বত্বগুণসম্পন্না–শান্ত, পবিত্র, সত্যশীলা ও দৈব সম্পদের অধিকারিণী কুমারীকেই জগজ্জননীর প্রতিমারূপে গ্রহণের বিধি আছে। পাখি যেমন একটি ডানায় উড়তে পারে না, সমাজও তেমনি শুধু পুরুষশক্তি দ্বারা চলতে পারে না। কুমারীপূজা নারীকে মূল্যায়নের একটি সর্বোচ্চ শাস্ত্রীয় বিধি। নবমীতে হোমযজ্ঞের দ্বারা পূজার পূর্ণহূতি দেওয়ার রীতি আছে। দুর্গাপূজায় দশমী তিথিতে হয় দেবীর বিসর্জন। পূজায় দশমী তিথি বিজয়া দশমী নামে খ্যাত। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিলেন।

একই কারণে স্বর্গ-মর্ত্যে দুর্দিনে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল। সব দেবতার সম্মিলিত তেজ সৃষ্টি করেছিল মহামায়াকে। আবার সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই দেবী চণ্ডী অশুভকে বিনাশ করে স্বর্গ-মর্ত্যে ন্যায় আর শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থকেই আবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। প্রতিবছর মা আসেন, ভক্তের পূজা নিয়ে আবার ফিরেও যান কৈলাশে। শরতের কাশবনে যখন ফুলের শুভ্রতা, সনাতন বাঙালিরা তখন প্রস্তুতি নেয় মা দুর্গাকে মর্ত্যে বরণ করার জন্য। মায়ের আগমনে সন্তানের আনন্দ। শ্রীশ্রী দুর্গাপূজার মূল মন্ত্র হচ্ছে:

‘যা দেবী সর্বভুতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।’

অধ্যাপক অরূপ রতন চৌধুরী: একুশে পদকপ্রাপ্ত, শব্দসৈনিক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, অধ্যাপক, বারডেম হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস।

যতীন দাসের দুর্গা

রাহুল পুরকায়স্থ

শিউলি ফুটেছিল। গন্ধ ভেসে আসছিল কি! মনে নেই। উনুনের ধোঁয়া গন্ধ দিয়ে মনে রাখত শরতের ভোরগুলোকে। আমার মা উনুনে আঁচ দিতেন। উনুনের ধোঁয়া শিবের জটার মতো ভেসে যেত কৈলাশের দিকে। আমি ঘুম ঘুম চোখে পৌঁছে যেতাম কুমোরটুলিতে। দুর্গার কাছে, ওনার পুত্রকন্যাদের কাছে, অসুরের কাছে, সিংহ, মহিষ, প্যাঁচা, হাঁস, ইঁদুর ও ময়ূরের কাছে। তখন তারা অনেকেই খড়ের। আর তখনও খড়ের যে কোনো কাঠামোকে দেখলে মনে পড়ত ঘোলা রোডের খাটালের কথা, খড়ের বাছুরের কথা, দুগ্ধপ্রতারণা! আমাদের কলোনির দুর্গা তখন দু’জন। সেন্ট্রালের দুর্গা ও পূর্বাশার দুর্গা। সেন্ট্রালের দুর্গা প্রতিমার মুখ খুব চেনা। যেন এখনই বলে উঠবেন, সন্ধ্যা হয়ে এলো, এবার আয়, দুধমুড়ি খেয়ে পড়তে বোস। সাবেকি। আর পূর্বাশার দুর্গা, রণরঙ্গিনী তার রূপ। আমাদের শৈশবের রণপ্ররোচনা।

পূর্বাশার দুর্গাপুজো আমাদের যতীন দাস কলোনির প্রথম থিমের পুজো। থিমশিল্পীর নাম বিলকুল মনে আছে, তেমন মনে আছে কলোনির রূপান্তর টেইলার্সের নাম। (বাকী ১৮ পাতায়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

এন আর বি এ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন উত্তম কুমার মণ্ডল

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক ইন
আয়োজিত ২৩ তম শারদীয় দুর্গা পূজায়
সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আগমনীর আগমনে বনের
পাখি উঠলো গেয়ে,
শিশির ভেজা নতুন ভোরে,
মা আসছে আলো করে

শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছ

উত্তম কুমার মণ্ডল ও পরিবার

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

নবরাত্রিতে উপোস ভাঙবেন? এয়ার ফ্রায়ারে বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক ৩ পদ

পুজো-পার্বণের সময় যেমন জমিয়ে খাওয়া-দাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, তেমনই এই সময় ব্রত, উপোসও থাকে অনেকের। অবাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবীপক্ষ শুরুর পরের দিন থেকে শারদ নবরাত্রি পালনের রীতি। উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা ব্রত পালনের নিয়ম। সারা দিন উপোস করে কী খাবেন, এ নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। সারা দিনের পর তেলে ভাজা কিছু খেলে শরীর খারাপ করতেই পারে। তবে সব সময় তেলঝালহীন খাবারে জিভ তুষ্ট হবে তা-ও নয়। নবরাত্রিতে খাওয়ার জন্য বরং এয়ার ফ্রায়ারে স্বল্প তেলে বানিয়ে নিতে পারেন ৩ পদ।

কুমড়োর বড়া

কুমড়ো ও আলু মিহি করে কুচিয়ে নুন, হলুদ দিয়ে মেখে নিন। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবে। তার পর উপোসে যে আটা খাওয়া যায়, তা মিশিয়ে নিতে হবে এতে। চাইলে এর সঙ্গে লঙ্কাকুচিও মিশিয়ে নিতে পারেন। দিতে পারেন পছন্দমতো মশলাও। সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্রাশের সাহায্যে তেল মাখিয়ে নিন। তার পর এয়ার ফ্রায়ারে বেশ কিছু ক্ষণ উল্টে-পাল্টে সেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুচমুচে কুমড়োর বড়া।

সাবুর বড়া

দিনভর উপোসের পর সাবু খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সাবুর বড়া সাধারণত ছাঁকা তেলে ভাজা হয়। তবে সারা দিন পরে এতটা তেলে ভাজা খাবার খেলে শরীর খারাপ করতে পারে। বদলে সাবুদানার বড়া এয়ারফ্রায়ারেই করে নিন।

সাবু গরম জলে অন্তত ঘণ্টা চারেক ভিজিয়ে নিন। নরম হয়ে যাওয়া সাবুর সঙ্গে সেদ্ধ করে রাখা আলু, কিছুটা চিনেবাদাম ভাজার গুঁড়ো, নুন, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিন। সমস্ত কিছু ভাল ভাবে মিশিয়ে গোল গোল বড়ার আকার দিন। দু'পিঠে তেল ব্রাশ করে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে মিনিট দশেক এক এক পিঠ সেঁকে নিলেই, তৈরি হয়ে যাবে সাবুর বড়া।

পনির রোল

এটা ঠিক পরোটার মধ্যে পনির ভরে দেওয়া নয়। পনিরের মধ্যে পুর ভরে দিতে পারেন। পনির মিহি করে নিতে হবে। তাতে দিয়ে দিন স্বাদ মতো নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে, ধনেপাতা কুচি, আদা কুচি। সমস্ত উপকরণ হাত দিয়ে মেখে মসৃণ করে নিন। গোল বলের মতো করে তার মধ্যে বাদাম এবং কাজু ভরে দিন। এ বার পনিরটি হাতে করে ঘুরিয়ে লম্বাটে আকার দিয়ে দিন। উপর থেকে তেল ব্রাশ করে এয়ার ফ্রায়ারে উল্টে পাল্টে মিনিট ১৫-২০ সেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পনিরের নতুন পদ।

সুস্বাদু প্রাতরাশ খেয়েই পুজোর আগে ঝরিয়ে ফেলুন পেট

সুস্বাদু প্রাতরাশ খেয়েই পুজোর আগে ঝরিয়ে ফেলুন পেট-কোমরের মেদ, সহজেই বানান ওট্‌সের প্যানকেক ওট্‌সের খিচুড়ি বা দুধ-ওট্‌স খেয়ে যদি অরুচি হয়, তা হলে ওট্‌স দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু প্রাতরাশ– ওট্‌সের প্যানকেক। পুষ্টিকরও হবে, ওজনও ঝরবে তাড়াতাড়ি।

পুজোর আগে ক'টা দিনে একটু স্বাস্থ্যকর কিছু খেয়ে ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন অনেকেই। লুচি-আলুর দমের বদলে পাতে উঠেছে ওট্‌স, ডালিয়া, কিনোয়া। ওট্‌সের খিচুড়ি বা দুধ-ওট্‌স খেয়ে যদি অরুচি হয়, তা হলে ওট্‌স দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু প্রাতরাশ– ওট্‌সের প্যানকেক। পুষ্টিকরও হবে, ওজনও ঝরবে তাড়াতাড়ি। বাড়ির খুদে সদস্যটিকেও খাওয়াতে পারেন এই স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশ। চাইলে টিফিনেও দিয়ে দিতে পারেন।

ওট্‌সের প্যানকেক বানাবেন কী ভাবে?

উপকরণ

কলা: ২টো
ডিম: ২টো
ওটস: আধ কাপ
বেকিং পাউডার: আধ চা চামচ
নুন: ১ চিমটি
ভ্যানিলা এসেন্স
মধু: পরিবেশনের জন্য
পছন্দের ফল: পরিবেশনের জন্য

প্রণালী

কলা ছাড়িয়ে চটকে নিন। দু'টি ডিম কলার সঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এ বার ডিম-কলার মিশ্রণের সঙ্গে ওট্‌স, বেকিং পাউডার, নুন ও ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিট রেখে দিন যাতে কিছুটা ঘন হয়ে ওঠে। ননস্টিক প্যান গরম করুন। গোল হাতা বা বাটিতে করে মিশ্রণ তুলে প্যানে দিন। এক পিঠ বাদামি হয়ে এলে উল্টে অন্য পিঠ বাদামি করে সেঁকে নিন। নামিয়ে নিয়ে উপরে মধু ও পছন্দের ফল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। স্ট্রবেরি, কালো আঙুর বা আপেল কুচিয়ে দিতে পারেন। ইচ্ছে হলে কলা গোল গোল করে কেটেও দিতে পারেন। খেজুর বা কাঠবাদামের মতো ড্রাই ফ্রুটস কুচিয়ে দিলেও ভাল লাগবে খেতে।

টম্যাটো সস্ বানাবেন কী ভাবে?

সস্ বেশি দিন টাটকা রাখতে ও স্বাদ বাড়াতে এমন কিছু রাসায়নিক মেশানো হয়, যা শরীরের জন্য বিষ। তাই দোকানের ভরসায় না থেকে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু টম্যাটো সস্।

চপ-পেঁয়াজি-শিঙাড়ার সঙ্গে টম্যাটো সস্ না হলে কি আর জমে! ম্যাগি হোক বা তেলেভাজা, টম্যাটো কেচআপ না হলে স্বাদ যেন ঠিক খোলে না। বাড়ির খুদে সদস্যটি এমন সাদামাটা খাবার খেতে চায় না। তাই বাজার থেকে হরেক রকম সস্ কিনে আনছেন। বিশেষ করে টম্যাটো সস্। কিন্তু জানেন কি, বাজারচলতি সস্‌ে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক থাকে? সস্ বেশি দিন টাটকা রাখতে ও স্বাদ বাড়াতে এমন কিছু রাসায়নিক মেশানো হয়, যা শরীরের জন্য বিষ। তাই দোকানের ভরসায় না থেকে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু টম্যাটো সস্। খরচও বাঁচবে, স্বাস্থ্যকরও হবে। পুজোর সন্ধেয় ঘরে বানানো সস্‌ে ভাজাভুজি ডুবিয়েই জমে উঠবে আড্ডা।

টম্যাটো সস্ বানাবেন কী ভাবে?

উপকরণ

টম্যাটো ১ কিলোগ্রাম
রসুন ২ চা চামচ
চিনি ও নুন ২ চা চামচ করে
গরম মশলা ১ চা চামচ
কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা চামচ
ভিনিগার ২ চা চামচ
জল ২ কাপ

প্রণালী

টম্যাটো ভাল করে ধুয়ে জলে সিদ্ধ করে নিন। তাতে এক চামচ রসুন বাটা মেশান। ভাল করে ফুটে থকথকে মিশ্রণ তৈরি হলে গ্যাস বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন। এ বার মিক্সরে ওই মিশ্রণটি ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিহি পেস্ট তৈরি হবে। এ বার মিশ্রণটি ছেঁকে নিতে হবে। টম্যাটোর খোসা যেন না মিশে থাকে। এ বার মিশ্রণটি সসপ্যানে ঢেলে ফুটতে দিতে হবে। তার সঙ্গে মেশাতে হবে নুন, চিনি, গরম মশলা ও লঙ্কার গুঁড়ো। কম আঁচে ধীরে ধীরে মশলাগুলি টম্যাটোর সঙ্গে মিশতে দিন। এর পর তাতে মেশান ভিনিগার। সসে নুন আর চিনির ভারসাম্য বজায় রাখবে ভিনিগার। এই মিশ্রণটি একটি কাচের বোতলে ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিন। কোনও রকম রাসায়নিক ছাড়াই ঘরোয়া উপকরণে তৈরি এই টম্যাটো সস্ বাড়ির খুদে সদস্যেরাও চেটেপুটে খেতে পারবে।

আমিষে আপত্তি, প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে দিন শুরু করতে পারেন এই ৩ টোস্ট দিয়ে

সকালের খাবারে স্বাদ বদলে খেতে পারেন রকমারি টোস্ট। ডিম বাদ দিয়ে প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে কোন ৩ পদ বেছে নেবেন?

প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ হবে, খেতেও স্বাদু হবে। কোন ধরনের টোস্ট তালিকায় রাখবেন? দিনভর দৌড়ঝাঁপ সামাল দেওয়া যায়, যদি সকালটা সঠিক ভাবে শুরু হয়। শরীর ভাল রাখতে ঘুম থেকে উঠে শরীরচর্চা করতে বলেন চিকিৎসকেরা। একই সঙ্গে জোর দেওয়া হয় সকালের খাবারে। কারণ, দিনভর কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সেখান থেকেই আসে। তবে খাওয়া মানে শুধু পেট ভরানো নয়, বরং পুষ্টিবিদেরা বলেন, সেই খাবার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

কোষ গঠন থেকে শরীর সুস্থ রাখা, পেশি গঠনে প্রোটিন প্রয়োজন। প্রোটিনের অন্যতম উৎস হল মাছ, মাংস, ডিম। সকালে টোস্টের সঙ্গে ডিম খেলে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়। কিন্তু যাঁরা মাছ, মাংস, ডিম খান না, তাঁরা কী খাবেন?

মাশরুম টোস্ট

মাশরুম খেতে কিছুটা মাংসের মতোই। এতে থাকে প্রোটিন, ফাইবার। মাশরুমে বিটা গুকান নামক এক ধরনের দ্রবণীয় ফাইবার পাওয়া যায়, যা কোলেস্টেরলের সমস্যা দূর করে। সকালের খাবারে রাখতে পারেন মাশরুম টোস্ট। মাশরুম ধুয়ে পাতলা করে কেটে নিতে হবে। কড়াইয়ে সাদা তেল বা মাখন দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি দিয়ে মাশরুম ভেজে নিন। ছড়িয়ে দিন স্বাদ মতো নুন ও গোলমরিচ। একদম শেষ ধাপে এতে কিছুটা চিজ অথবা ক্রিম মিশিয়ে নিতে পারেন। পাউরুটি সেঁকে তার উপর রান্না করা মাশরুম দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে মাশরুম টোস্ট।

পনির টিক্কা টোস্ট

পনির টিক্কা তৈরি করে তা দিয়েও টোস্ট বানাতে পারেন। পনির থেকেও প্রোটিন পাওয়া যায়। একটি পাত্রে জল ঝরানো টক দই, হলুদ, কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, কসৌরি মেথি, তেল দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। তাতে টুকরো করে কাটা পনির মিশিয়ে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। এ বার কড়াইয়ে তেল দিয়ে প্রথমে পনিরের টুকরোগুলি টিক্কার মতো সেঁকে নিন। পাউরুটিতে পনিরের টুকরো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম দিয়ে এবং উপর থেকে চিজ দিয়ে হালকা গরম কড়াইতে বসিয়ে আঁচ কমিয়ে, উপর থেকে ঢাকা দিয়ে দিন। ২ মিনিটে পাউরুটির উপরের চিজ গলে যাবে। মুগডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। এতে রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন বি৬, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম-সহ নানা রকম খনিজ। সকালের খাবারে তাই মুগডাল শরীরের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। ভেজানো মুগডাল বেটে তার মধ্যে দিন স্বাদ মতো নুন, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, গাজর কুচি। মিশ্রণটি ভাল করে মিশিয়ে পাউরুটিতে মাখিয়ে তেল দিয়ে সেঁকে নিলেই তৈরি মুগডালের টোস্ট।

পুজোয় বাড়িতেই হোক পেটপুজো! সয়া-মটনের দুই পদে জমে যাবে দুপুরের ভোজ

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী এবং দশমীর দিন বহু বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। আবার অনেকেই পুজোর ক'দিন নিরামিষ খাবার দাঁতেও কাটেন না। পুজোর সময় বাড়িতে মনের মতো খাবারও হবে আর তা তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এমন রেসিপির খোঁজ করছেন?

পুজোর ক'দিন আমিষ-নিরামিষ পদেই জমবে ভূরিভোজ।

দুর্গাপুজো মানেই সারা বছর ধরে জমিয়ে রাখা আবেগ, উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ। কাজকর্ম সামলে ক'দিনের আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া। বাঙালির উৎসবের আনন্দের সঙ্গে ভূরিভোজ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। পুজোর ক'দিন ভালমন্দ খেতেই হবে। রাতের বেলা বাইরে খাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে দিনের বেলায় বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া সারতে পছন্দ করেন কেউ কেউ। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমীর দিন বহু বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। আবার অনেকেই পুজোর ক'দিন নিরামিষ খাবার দাঁতেও কাটেন না। পুজোর সময় বাড়িতে মনের মতো খাবারও হবে আর তা তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এমন রেসিপির খোঁজ করছেন? রইল সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারেন, এমন একটি আমিষ ও একটি নিরামিষ পদের রেসিপি।

সয়া মুইঠ্যা উপকরণ:২৫০ গ্রাম সয়াবিন২ টেবিল চামচ আদা-কাঁচালঙ্কা বাটা২ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো২ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো১ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো স্বাদমতো নুন ও চিনি২ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি২ টেবিল চামচ বেসনপরিমাণ মতো তেল ৪টি কাঁচালঙ্কা২ টেবিল চামচ আদা কুচি৮-১০টি কাজুবাদাম২ টেবিল চামচ দই৫-৬ টুকরো ভাজা আলু (ডুমো করে কাটা)
১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো
আধ চা চামচ ঘি

প্রণালী:

সয়াবিন সেদ্ধ করে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। এ বার একটি পাত্রে সয়াবিনের মিশ্রণ, আদা-কাঁচালঙ্কা বাটা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরমমশলা গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন ও চিনি, ধনেপাতা কুচি ও বেসন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এ বার মিশ্রণটিতে অল্প করে হাতে তুলে মুইঠ্যার আকারে গড়ে নিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। এ বার কাঁচালঙ্কা, আদা আর কাজু বাদামের একটি পেস্ট বানিয়ে নিন। আর একটি কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে ভাজা আলু দিয়ে বেটে রাখা মশলা, সব রকম গুঁড়ো মশলা আর দই ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে সামান্য জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। মিনিট দুয়েক পর ভেজে রাখা মুইঠ্যাগুলি দিয়ে খানিক ক্ষণ ঢেকে রাখুন। এ বার উপর থেকে ঘি, গরমমশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন সয়া মুইঠ্যা।

মটন সুখা

উপকরণ:

৫০০ গ্রাম পাঁঠার মাংস (ছোট টুকরোয় কাটা)
আধ কাপ টক দই
১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
১ টেবিল চামচ লেবুর রস
৫ টেবিল চামচ ঘি
৭-৮ টি শুকনো লঙ্কা
আধ চা চামচ মেথি
২ টেবিল চামচ ধনে
১ টেবিল চামচ জিরে
৭-৮টি গোটা গোলমরিচ
২ টেবিল চামচ রসুন বাটা
স্বাদমতো নুন
৪-৫ টি লবঙ্গ
আধ চা চামচ চিনি
২ টেবিল চামচ তেঁতুলের ক্বাথ
আধ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো

প্রণালী:

একটি পাত্রে মাংস নিয়ে তার সঙ্গে লেবুর রস, হলুদ, দই ও নুন মাখিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন ৩-৪ ঘণ্টা। এ বার শুকনো খোলায় ভেজে রাখুন শুকনো লঙ্কা, জিরে, ধনে, লবঙ্গ, মেথি, গোলমরিচ। ভেজে রাখা গোটা মশলা মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। এ বার কড়াইতে ঘি গরম করে চিনি দিয়ে দিন। খানিক ক্ষণ নেড়েচেড়ে তাতে রসুন বাটা দিয়ে দিন। তার পর মাংস আর বেটে রাখা মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ দিয়ে দিন। কষানোর সময় অল্প অল্প করে গরম জল দিতে পারেন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে গরমমশলা গুঁড়ো দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন মটন সুখা।

তরমুজে কি পানি আর চিনি ছাড়া কিছুই নেই? (ছবি আছে রেসিপি পিকচার নং-০৭)

তরমুজে পানি আর চিনি ছাড়া কিছু নেই–অনেকের এমন ধারণা থাকলেও তা আদতে ঠিক নয়। এই ফল নানা ধরনের ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ।

সম্প্রতি তরমুজের দাম তুলকালাম কান্ডই ঘটে গেল। দাম যে এখনো হাতের নাগালে, তা ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে মৌসুমের শুরুর তুলনায় কিছুটা কমেছে। ফলে অনেকেই তরমুজ কিনছেন। এই গ্রীষ্মে তৃষ্ণা দূর করতে আর শক্তি জোগাতে তরমুজ আকর্ষণীয় বটে।

তরমুজে আছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় অংশ, যা পানিশূন্যতা রোধ করে; আর আছে বেশ খানিকটা শর্করা, যা বাড়তি শক্তি জোগায়।

এক কাপ পরিমাণ তরমুজের টুকরায় থাকে প্রায় ৪৫ ক্যালরি শক্তি, ১০ গ্রামের মতো চিনি বা শর্করা, এক গ্রাম আঁশ। এতে চর্বি বা ফ্যাট নেই।

এক কাপ পরিমাণ তরমুজের টুকরা খেলে দৈনিক ভিটামিন এ-র যে চাহিদা, তার ৭ শতাংশ ও ভিটামিন সি-র ২১ শতাংশ পূরণ হবে। এ ছাড়া তরমুজে পাবেন ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন বি সিক্স এবং ফলেট।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জয় হরিচাঁদ জয় হরিবোল জয় গুরুচাঁদ

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৬ ইং

:পূজা মণ্ডপ :

শ্রী শ্রী হরি মন্দির

৯৭-১৯ ১২৭ স্ট্রীট, সাউথ রিচমণ্ড হিল,
নিউইয়র্ক ১১৪১৯

মহা ষষ্ঠীর বিশেষ আমন্ত্রণ ও গীতি-আলেখ্য

তারিখঃ ১৬ অক্টোবর শুক্রবার।

সুধী,

পরম করুণাময় শ্রী শ্রী শারদীয়া মায়ের অশেষ কৃপায় আগামী ১৬ অক্টোবর, ২০২৬, শুক্রবার, আমাদের মন্দিরে অত্যন্ত ভক্তিঘন পরিবেশে দেবীর মহা ষষ্ঠী বিহিত পূজা, বোধন এবং অধিবাস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মায়ের এই মহাসন্ধিক্ষণে ও মাঙ্গলিক আবাহনে উপস্থিত থেকে পুণ্য অর্জনের জন্য আপনারা সমস্ত সপরিবারে ও বন্ধুবান্ধবসহ সাদরে আমন্ত্রিত।

মহা ষষ্ঠী বিহিত পূজা, দেবীর বোধন এবং অধিবাস পর্ব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সুসম্পন্ন হওয়ার পর পরিবেশিত হবে আগমনীর চিরন্তনী সুর। মায়ের আগমনের সেই চিরন্তন ব্যাকুলতা আর আনন্দকে গানের ছন্দে, কথায় ও সুরে বরণ করে নিতে আমাদের মাঝে মায়ের আগমনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতি ইতি মণ্ডল, শ্রীমতি শিবানী রয় শ্রী সুশীল সিনহা, শ্রী নীহার সরকার এবং অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সূচীঃ

- মহা ষষ্ঠীর বিহিত পূজাঃ কল্পারম্ভ, অকাল বোধন এবং অধিবাস সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা
- মহাষষ্ঠীর বিশেষ আমন্ত্রণ ও গীতি-আলেখ্য সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা।

পুরোহিত
শ্রী অসিত কুমার চক্রবর্তী

প্রসাদ পরিবেশন করা হবে।

বিনীত নিবেদক

শ্রীমতী শিখা রানী ঠাকুর (৯১৭-৯০২-৭০৪৫), শ্রীমতী সুমিতা বিশ্বাস (৩৪৭-২৮০-৭০২৭), শ্রীমতী শোভা ঘরামী (৩৪৭-৯০৮-২৬৫৪), শ্রীমতী সুরভী বৈদ্য (৩৪৭-৫২০-২৫৫৭), শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় (৭১৮-৯০২-৮০০৭), শ্রীমতী শিবানী হীরা (৬৪৬-৪০৬-৮০৬৪), শ্রীমতী দীপা দাস তিথি (৬৪৬-৪৯২-৯৪৯৯), শ্রীমতী বিনা বিশ্বাস (৭১৮-৭০৮-১৫৯৭), শ্রী পলাশ ঘোষ (৭১৮-৫১৭-১২৯২), শ্রী সুব্রত সেন (৩৪৭-৪৮৪-২৫৯৮), শ্রী সুব্রত শীল (৩৪৭-৯৪৪-৭৫৮২), শ্রী গৌতম শিকদার(৭১৮-৮৭৮-৮৯৮০),শ্রী দীপঙ্ক পোদ্দার (৩৪৭-৮৫৫-০৯০৬), শ্রী পুলক সাহা (৯২৯-২৮৯-৫৯১২)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবিকা এবং সেবকগণ
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬

শুভেচ্ছান্তে, সমর রায়, শুক্লা রায় ও স্টেচী রায়,

মা দেবী দূর্গা সবার মঙ্গল করুক, সবাই সুখী হোক — ওঁ শান্তি !!

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয়ঃ রানা রায়

জন্মঃ ১৯৬৯, মৃত্যুঃ ২০২৬

নয়নে সম্মুখে তুমি নাই নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

শারদীয়ার পুজালগ্নে তোমায় স্মরণ করি।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
শারদীয় উৎসবে আজ, মাতলো শহর গ্রাম
ছন্দে-মুখর সবার মুখে, দুর্গা মায়ের নাম
শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬
শুভ শারদীয়া
AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant
We Provide Broad Services in
Computerized Book-Keeping & Accounting Services
New Business Set Up- Corporation, LLC, P.C.
Not for Profit & Tax Exempt Status.
Business Taxes Including Corporation & Partnership
Individual Taxes
Payroll, Sales & Local Taxes
Not for Profit Including Tax Exempt Organization
Audit & Certified Financial Statement
Anjan K. Bhattacharjee
We Also Provide Following Services:-
Obtain Tax Identification Number (TIN), WIC License, Lotto
Application, Food Processing License, Cigarette & Sales
Tax Registration, Bear License and all other related License and Permits.
We Fill out Immigration Forms like Citizenship, Affidavit of Support, etc.
We can Help you file joint return even if your spouse is not living in the USA.
AUTHORIZED
IRS
IRS e-file
PROVIDER
IRS APPROVED , E-FILE PROVIDER, NOTARY PUBLIC
150-16 Hillside, Ave. 1st Floor, Jamaica, NY-11432
Tel:- 718-658-8767, Cell:- 917-371-3633
Fax:- 718-658-8765, E-mail:- abhattacharjee@gmail.com
40 Years
Experienced
Year Round Service

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
Vol 26 No.35 Thursday 16 October 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি :
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

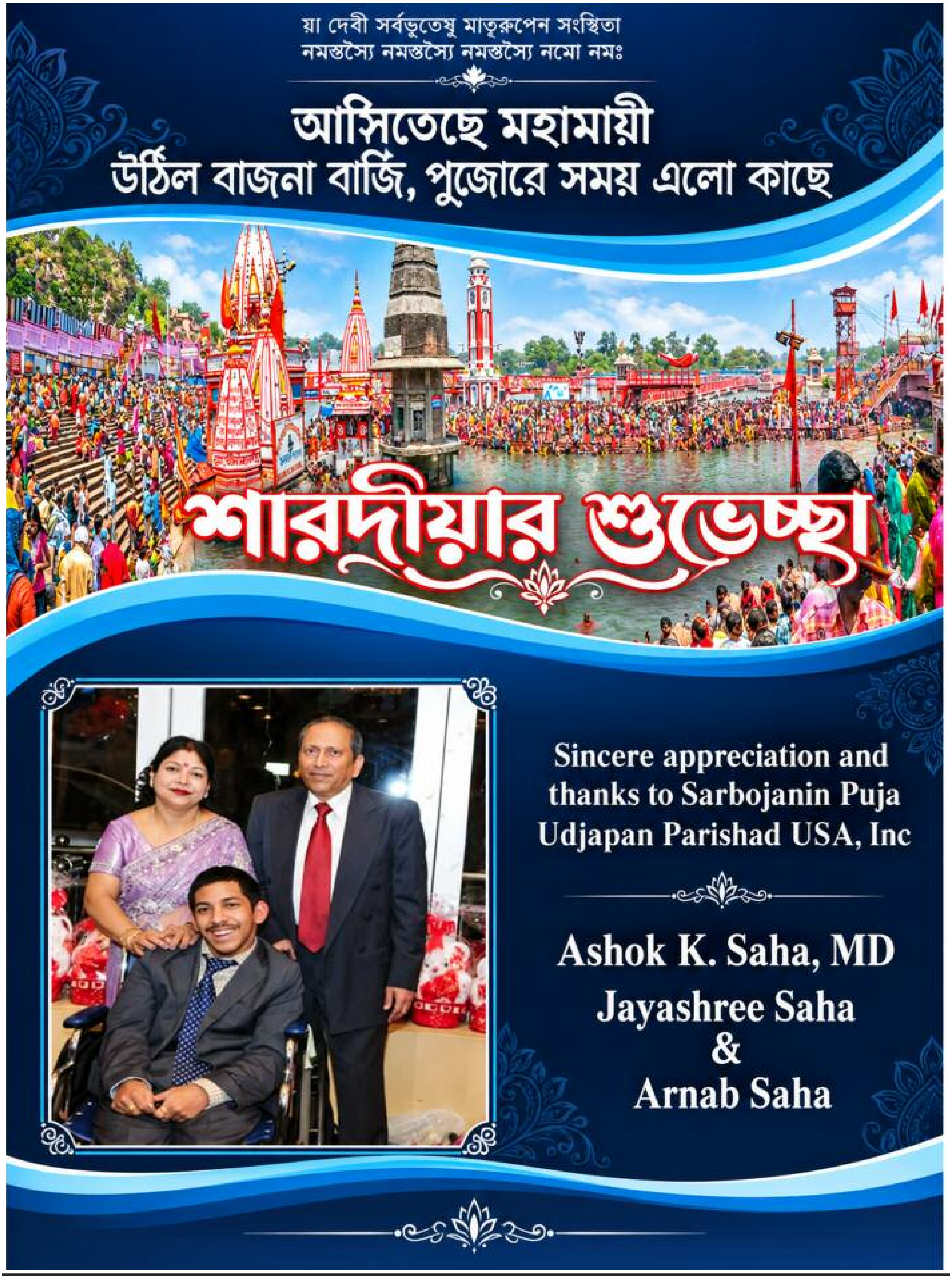
য়া দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
আসিতেছে মহামায়ী
উঠিল বাজনা বাজি, পুজোরে সময় এলো কাছে
শারদীয়ার শুভেচ্ছা
Sincere appreciation and thanks to Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc
Ashok K. Saha, MD
Jayashree Saha
&
Arnab Saha

শুভ শারদীয়া
HAPPY Durga Puja
সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা
শুভেচ্ছান্তে:দীপক দাস
রিমা দাস (আমেরিকান প্রবাসী)
সৌজন্যে: লোহাগড়া সর্বজনীন পূজা কমিটি
লোহাগড়া,নড়াইল

তুমি সকল লোকের ঈশ্বর, হে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি ॥
শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬
SRS Auto Repair Shop
Transmission & Body Shop
Wheel Alignment and General Repairs
Wheel Alignment and General Repairs
Transmission & Body Shop
Glass &Tyre
Services available
AUTO DEALER
Shyamal Rudra (Samu)
Tel: 917-371-1533
এস আর এস অটো সপ
38-17 Woodside Avenue, Woodside, NY 11377
Tel: 718-361-8674, Cell: 917-371-1533
Email: samurudra@yahoo.com

শুভ শারদীয় শুভেচ্ছা
আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের পূজোর দিনগুলো
খুব আনন্দে, সুখে এবং শান্তিতে কাটুক।
মা দুর্গার আশীর্বাদে আপনার জীবন আলোয় ভরে উঠুক
DEBNATH ACCOUNTING INC.
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Subal C Debnath, MAFM
NOTARY PUBLIC
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: CertifiedPublic Accounting (CPA)
●INCOME TAX ●SALE TAX ●ACCOUNTING
●PAYROLL ●BUSINESS OPEN ●IMMIGRATION
37-53 72nd Street, Ground Floor, Jackson Heights, NY 11372
Ph : (917) 285-5490 I E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
সার্বজনীন
শ্রীশ্রী শারদীয়
দুর্গা পূজা
২০২৬
: পৌরহিত্য করবেন :
শ্রী রতন কুমার চক্রবর্তী ও
শ্রী শিব শেখর ব্রহ্মচারী
পূজার পরপরই অঞ্জলি প্রদান (প্রতি ৪৫ মিঃ পর পর)
পূজাঙ্গন: নিউইয়র্ক হিন্দু টেম্পল
১৬৪-১০ ফচ্ বুলভার্ড, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৪
তারিখ: ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর
(শুক্র, শনি, রবি, সোম ও মঙ্গলবার)
মহা ষষ্ঠী
শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর
মহা সপ্তমী
শনিবার, ১৭ অক্টোবর
মহা অষ্টমী ও সন্ধিপূজা
রবিবার, ১৮ অক্টোবর
মহা নবমী
সোমবার, ১৯ অক্টোবর
বিজয়া দশমী ও
সিঁদুর দান
মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর
সুধী সনাতনী ভক্তবৃন্দ,
নমস্কার, আসছে ১৬ অক্টোবর শুক্রবার থেকে ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার ২০২৬ ইং পর্যন্ত তিথী, নক্ষত্র ও সনাতনী রীতিনীতি অনুযায়ী নিউইয়র্ক হিন্দু টেম্পলে, এই প্রথমবারের মত মহা সমারোহে ৫ দিন ব্যাপি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজো।
উক্ত সার্বজনীন দুর্গোৎসবে আপনারা পরিবার-পরিজন নিয়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি।
• শ্রীশ্রী চন্ডী পাঠ
• মাতৃ বন্দনা
• সন্ধ্যারতি
• সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ডাঃ শ্রী সুভাষ সি. শিকদার
৯১৭-৪৪২-১৭৯৭
শ্রী দীপক লাল কর্মকার
৯১৭-২৮৮-৩২৫৪
শ্রী তপন সাহা
৬৪৬-২৭০-৭৬৩২
শ্রী রঞ্জিত দে রায়
৯১৭-৪৫৯-৭১১০
মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে
শ্রী সুমন চন্দ্র সরকার
শ্রী রঘু সুত্রধর
শ্রী অঞ্জন ঘোষ
শ্রী সুমন সাহা
শ্রী স্বজন কে. বণিক
শ্রী অনুপম হালদার
প্রচার সম্পাদক - রূপক নন্দী দ্বারা প্রচারিত ও প্রকাশিত (৭১৮) ৭০৮-৯৬৭০
সার্বিক আয়োজনে : নিউইয়র্ক হিন্দু টেম্পল
Organized by : NEW YORK HINDU TEMPLE
164-10 Foch Blvd., Jamaica, NY 11434. PH: 718-435-3206 | Email: temple16410@gmail.com

শারদীয়া অভিনন্দন
বাংলা স্কুলে ভর্তি চলছে
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
এষ্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
সময়: সকাল ১০:০০ টা থেকে রাত ১০ টা
৭ দিনই খোলা
বিষয় সমূহ:
সঙ্গীত
বাংলা
অঙ্কন
আবৃত্তি
তবলা
হারমোনিয়াম
টিউটোরিয়াল:
কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ গ্রেড
এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সহ
সব ধরনের গান শেখানো হয়।
Sabita Das
Founder & President
Radio, TV Vocal Artist
Music Teacher
স্কুলের ঠিকানা :
৩৫-১৮, ৩৩ ষ্ট্রিট, এষ্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮
যোগাযোগ:
সবিতা দাস (এস্টোরিয়া) (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮
চমেন আফরোজ (এস্টোরিয়া) (৯১৭) ৮০৫-৭০৪০
উইলী নন্দী (জে. হাইটস) (৩৪৭) ৯৮১-২৯৮২
সুলতানা নাসরীন (ইস্ট এলমহার্স্ট) (৩৪৭) ৯৮১-৫৬৩৬
কানিজ আয়েশা (জে. হাইটস) (৩৪৭) ৬৬৬-১১৯৬
সুলতানা আহমেদ (ব্রঙ্কস) (৩৪৭) ৬৫৩-৫০৯৫
জুই ইসলাম (ব্রঙ্কস) (৬৪৬) ৩০৯-৩৫৭৬
শারমিন (উডসাইড) (৯১৭) ৩৬১-২৮১০
সায়মা জামান (জামাইকা) (৩৪৭) ৮৩৭-০৭৩৩
নিলুফার ইয়াসমিন (এস্টোরিয়া) (৩৪৭) ৮৮১-৭১৭৯
স্নিগ্ধা ইসলাম (এস্টোরিয়া) (৯১৪) ৬৭০-১৬৬৯

Dr. Mita
Chowdhury, MD.
Compassionate Care for a Healthier Tomorrow
YOUR
HEALTH
OUR PRIORITY
শারদীয় শুভেচ্ছা২০২৬
পুজায় সবাইকে শারদীয় অভিনন্দন
Healthy People Brighter Communities
Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician
Elmhurst Hospital Center
BOARD CERTIFIED
IN INTERNAL MEDICINE
EXPERIENCE • KNOWLEDGE • BETTER HEALTH
OUR SERVICES:
Complete Primary Care
Diabetes, Blood Pressure
Cholesterol, Asthma, Thyroid
Heart Disease Management
All Vaccination
On Site blood work, EKG and Urine Testing
Weight Management
Fill-out Medical Form
Immigration Physical
Age appropriate Cancer Screening
OUR SERVICES:
প্রাথমিক কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল
হাঁপানি, থাইরয়েড, হৃদরোগ ব্যবস্থাপনা
সকল প্রকার টিকা
নিজস্ব অফিসে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি ও প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিক্যাল ফরম পুরণ
ইমিগ্রেশন ফিজিক্যাল
বয়স উপযোগী ক্যান্সার স্ক্রিনিং
20 YEARS EXPERIENCE
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
718-233-8871
Call Us Now
CARE
PREVENT
MANAGE
LIVE BETTER
WE SPEAK BENGALI, HINDI & URDU TOO.
MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village, NY 11427
Tel: 718-233-8871, 929-331-5702 | Fax: 718-465-1199
www.drmitachowdhury.com
A Healthier Community Together

নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ॥
রোদ্র বৃষ্টি মাখামাখি, কাশবনকে দুলতে দেখি
নতুন ভোরের আলোর সাথে, নতুন সাজে উঠবে মেতে
বিদ্যাদেবীর আগমনের সুরে, সরস্বতী পূজোর আমেজ ঘরে ঘরে।
ধর্ম বর্নের সম্প্রীতিতে পৃথিবী হোক সবার জন্যে।
ভজন সরকার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই সরস্বতী পূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
শ্রী ভজন সরকার ও তার পরিবার

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬

NEW YORK DIABETES & ENDOCRINE WELLNESS CENTER

ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইন (হরমোন) স্পেশালাইষ্ট চিকিৎসা করা হয়

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের রাজধানী খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র থেকে সেবা প্রধান করি।

Dr. Kaushik Mandal , MD

Board Certified Specialist in Endocrinology, Internal Medicine, Obesity Medicine

affiliated with Mount Sinai, South Nasssau, Jamaica Hospital Medical center

Faculty attending endocrinol-ogist at Nassau University Medical Center

Queens: 70-17 37th avenue, Jackson Heights NY 11372

Long Island: 230 Hilton Avenue Suite 106, Hempstead NY 11550

Ph: 516-666-4112

Fax: 516-666-4115

Web: www.nydewc.com

Office email: contact@nydewc.com

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৬

Please Visit our YouTube Channels

Ratan Talukder Live NY

Jonmobhumi News TV

Alaap USA

Phone: (646) 327 7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Web: www.jonmobhumi.com

Ratan Talukder, Host

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৫

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এলো কাছে

শারদীয়

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

Tarak gayen

Sujata gayen

Shiv Shakti Peeth
264-12 Hillside Avenue, Floral Park NY 11004
MATA KI
VISHAL CHOWKI
Saturday October 17, 2026
5.00 pm to 8.00 pm
Aarti and Langar Prasad
Reply...

শরতের নীল আকাশে গনন পটুয়া করে সাদা মেঘের খেলা
মন হারিয়ে যায় দেশান্তরে, চড়ে যেন সেই সাদা মেঘের ভেলা।

দেশে-বিদেশে সকলকে জানাই পূজা অভিনন্দন।
শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সকলকে।

Dr. Sarmir Sarker
Dr. Nirmala Golder Saker & Family
Long Island, New York

২৫ বছর পর...
২৬ বছরে আগামীর পথে ...
নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমির ২৬ বছরে পদার্পনের শুভলগ্নে সকল পাঠক, লেখক, সাংবাদিক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ও অভিনন্দন।
প্রিন্ট, অনলাইন, ফেইসবুক,
ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায়!
সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
www.jonmobhumi.com
+1 (646) 327-7964
RatanTalukderLiveNY
RatanTalukderLiveNY
jonmabhumi@gmail.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com

রাজেশ্বরী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী

www.jonmobhumi.com